# বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

## প্রথম খণ্ড

শ্রী কালিদাস রায়



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা · ১২

॥ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

॥ বৈশাখ : ১৩৬৪ ॥

॥ দাম : আট টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক, সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রাতৃবরেষু

# ॥ পরিচায়িকা ॥

কবিশেখর শ্রীকালিদাস সুবৃহৎ কয়েক খণ্ড গ্রন্থে তাঁহার বাংলা সাহিত্যের তীর্থপরিক্রমার মূল পর্যায়টি সমাপ্ত করিয়াছেন। সুদূরপ্রসারিত বাংলা সাহিত্যের বঙ্গসাগর তিনি সমালোচনার ভেলায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকবৃন্দকে তাঁহার রসাত্মক অনুভূতি ও কবিজনোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন ও পাঠকের নিকট তিনি তাঁহাদের মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার মধ্যে পাণ্ডিত্যের স্পর্ধা বা বিশেষজ্ঞের ভীতিপ্রদ তত্ত্বসমাবেশ নাই, আছে দরদী মনের সূক্ষ্ম রসগ্রাহিতা। কবিমনের সুকুমার স্পর্শে, বিধিদত্ত আত্মীয়তার অধিকারবলে কবিশেখর মহাশয় তাঁহার কবিভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তরের নিগূঢ় পরিচয়টি নিজে জানিয়া পাঠককে জানাইয়াছেন। এই কাজটি পেশাদার পাণ্ডিত্যসম্বল সমালোচকদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

যেরূপ অপূর্ব নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কবিশেখর মহাশয় তাঁহার সাহিত্যবিচার সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধনাকে সত্যই তীর্থযাত্রার সহিত তুলনা কর' যায়।

প্রত্যেকটি লেখক তীর্থদেবতার ন্যায় অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন। আমা‍ের মতো যাহাদের তীর্থযাত্রার দুর্গমপথ অতিক্রম করিবার শক্তি নাই, অথচ যাহারা তীর্থযাত্রার পুণ্যসঞ্চয়ের প্রতি লোভাতুর, তাঁহারা কবিশেখর মহাশয়ের মানস অনুসরণ করিয়া তাঁহার বিপুল সাধনার কিঞ্চিন্মাত্র ফলের অধিকারী হইবার প্রত্যাশী। প্রার্থনা করি, কবিশেখর মহাশয় সাহিত্যের নূতন নতন তীর্থস্থানে আমাদের পরিচালিত করিয়া আমাদের মুগ্ধ অন্তরের নিকট নূতন নূতন তীর্থমাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া মাদৃশ ক্ষীণপুণ্য প্রাকৃতজনের সুকৃতি বৃদ্ধির সহায়তা করিতে থাকুন।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# ॥ ভূমিকা ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস নয়। পদাবলী সাহিত্যে ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য তিন খণ্ডে যেমন প্রাচীন যুগের সাহিত্যরসীদের রচনার আলোচনা করা হইয়াছে—বঙ্গ সাহিত্যপরিচয়ে তেমনি আধুনিক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার পরিচয় উপনিবিষ্ট হইল।

বঙ্গ সাহিত্যপরিচয়ের তিন খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আরো দুই খণ্ড এখনও অপ্রকাশিত, এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে কয়েকটি নূতন নিবন্ধ সংযোজিত হইল। বলা বাহুল্য, তাহাতে গ্রন্থখানির আয়তনও বর্ধিত হইয়াছে।

বি-এ অনার্স ও এম-এ শ্রেণীর ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের আনুকূল্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই নিবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে। সকল নিবন্ধই বাংলার প্রধান প্রধান মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি নিবন্ধ আমার ছদ্মনাম উপগুপ্ত শর্মার নামাঙ্কিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য এই গ্রন্থেই সমাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থের স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের উপজীব্য।

আমি যখন সমালোচনা-সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হই—তখন দীনেশচন্দ্র সেন, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি সাহিত্যরথিগণ আমাকে উৎসাহিত করেন। তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে খুব বেশি লেখক ছিলেন না। বর্তমান যুগে সমালোচনা-ক্ষেত্রে বহু সুধীজনের সমাগম হইয়াছে। ইহাতে যেমন সুখী হইয়াছি, তেমনি পাঠকসংখ্যার হ্রাসের জন্য নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। পাঠকরা চায় রম্যরচনা,—সমালোচনা চায় না। তাহারা সাহিত্যিকদের প্রাকৃত জীবনের নানা কথা জানিতে চায়, কিন্তু তাঁহাদের সাহিত্য সাধনার বা সারস্বত অবদানের পরিচয় চায় না। সেজন্য ছাত্রসমাজের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ও আগ্রহে সমালোচনা সাহিত্যে ক্রমে ছাত্রদের অনুরাগ বর্ধিত হইতেছে। সমালোচনা আমার পেশা নয়, নেশা। আকৈশোর কবিতা লিখিয়াছি—আজিও লিখি। আমাকে সকলে কবি বলিয়াই জানে। কলেজের অধ্যাপক নই, আমি একজন শিক্ষক-কবি

মাত্র, সেজন্য অনেকে আমার সমালোচনাবৃত্তিকে অনধিকার চর্চাই মনে করিতেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাহা মনে করে নাই।

যে সকল সম্পাদক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপকগণ আমার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাদের উদ্দেশে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সন্ধ্যার কুলায়, টালিগঞ্জ। শ্রীকালিদাস রায়

# ॥❁॥ সূচীপত্র ॥❁॥

## প্রথম খণ্ড

# বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

### গদ্য রচনার সূত্রপাত

ইংরাজ শাসনের আগে বঙ্গভাষার প্রতি সংস্কৃত পণ্ডিতদের একটা অবজ্ঞা ছিল। তাঁহারা ত রীতিমত ফতোয়া দিয়াছিলেন—শাস্ত্রের কথা ভাষায় অর্থাৎ বঙ্গভাষায় লিখিলে রৌরব নরকে যাইতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ কিন্তু সে কথা কবিরা শোনেন নাই। ইংরাজ শাসনে ইংরাজী সাহিত্যের আস্বাদ পাইয়া—সেকালের ইংরাজীশিক্ষিত লোকেরাও বঙ্গভাষাকে অবহেলা করিত। নিধুবাবুর বিখ্যাত গানটিতে এই অবহেলার চমৎকার প্রতিবাদ আছে—"বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা? হ্রদনদে এত নীর কিবা বল চাতকীর ধারাজল বিনা তার মিটে তিয়াসা?"

ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য প্রভাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশা গুপ্তকবিকে কিরূপ ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত এই কয় ছত্র পড়িলেই বুঝা যায়—

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা। কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা। বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে। কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে॥"

শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইয়া বলেন,—"সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। অধুনা আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগের কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি; কারণ, ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি, সাংসারিক তাবৎ কর্ম্মই নির্ব্বাহ

করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না?

আমাদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুকোমল এবং মাধুর্য্য-রসে পরিপূরিত। এই ভাষার বাক্যের দ্বারা ও লেখনী দ্বারা উত্তমরূপে নানা কৌশলে ও সহজে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তরিক দ্বেষ হইল কেন? কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিল না, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না! হায় কি আক্ষেপ! নব্য বেঙ্গাল বাবুসাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা দেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন, তাহা কি দেখিতে পান না? * * কয়েকজন যুবা ব্যক্তি এ বৎসর টাউনহলে অতিশয় সদ্বক্তৃতাপূর্ব্বক বড় বড় ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবুসাহেবরা যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিমিত্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎপক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত। ফলে, তাহার চেষ্টা নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাথায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয় ভাষায় অতি নিপুণ, তাঁহার সহিত কোনও নবীন বেঙ্গলের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথনকালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়। যথা,—'কেমন ভাই, বাড়ীর সকল মঙ্গল তো',—'মশায়, আসুন, লাষ্ট নাইটে বড় ডেঞ্জারে পড়েছি, আঙ্কেলের কলেরা হয়েছে, পল্‌স্ বড় উইক হোয়েছিল, আজ মর্ণিংয়ে ডাক্তার এসে অনেকটা রিকভার করেছে, এখন লাইফের হোপ্ হয়েছে।'—সে ভাল মানুষ—বাবুজির উত্তর শুনিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভ্যাভ্যা-রামের ন্যায় অবাক হইয়া খাড়া থাকে। এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা বুঝিতে পারি একথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছেন যাঁহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করেন। যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করেন এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবিস বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা করেন।"

গুপ্তকবির শিষ্যদলের মধ্যে দ্বারকানাথ অধিকারী সুধীরঞ্জন নামক কাব্যে বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথনে—বঙ্গভাষার মুখ দিয়া বঙ্গভাষার জন্য যে ওকালতি করিয়াছেন তাহাতে সেকালের মনোভাব বেশ ভাল করিয়াই বোঝা যায়।

স্বদেশীয় ভাষ শিখিতে উল্লাস—না হয় অন্তরে যার,
বিধাতার ভুলে মানবের কুলে জনম হয়েছে তার।

এই বলিয়া তিনি বিদ্বেষীদের গালাগালি দিয়াছেন।

ঢাকার কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাঁহার মিত্রপ্রকাশ নামে মাসিকপত্রে "মাতৃভাষা উপেক্ষিদলের প্রতি" বলিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় এক তীব্র প্রবন্ধ লেখেন। এই যুগে মাইকেল প্রথমে বিদ্বেষীদের দলেই ছিলেন—তারপর 'মাতৃভাষারূপখনি পূর্ণ মণিজালে'—এ সত্য নিজে বুঝিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে 'কমলকানন ত্যাগ করিয়া' এতদিন ইংরাজি ভাষার উপাসনা করিয়া 'শৈবালে কেলি' করিতেছিলেন—বীণাপাণির এই রাজহংসের মুখে একথা শুনিয়া অনেকেরই চৈতন্য হইয়াছিল। ভূদেববাবুও মাতৃভাষার গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। সেকালের বিদেশীয় শিক্ষায় পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবহেলা করিয়া ইংরাজিতে যে সকল পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন—আজ সেগুলির কেহ নামও করে না।

সুখের বিষয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল বঙ্গভাষার দিকে মতিগতি ফিরাইয়াছিলেন—তাই ঈশ্বরচন্দ্র, রামনারায়ণ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, রামগতি ইত্যাদি সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ইংরাজি-শিক্ষিতগণের বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে নাই। বাঙ্গালা ভাষার পণ্ডিতী রূপ দেখিয়াই তাঁহারা আরও বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন। এরূপ ক্ষেত্রে মাইকেলই বঙ্গভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার মত বিধর্ম্মী ইংরাজি শিক্ষায় ধুরন্ধর সাহেব লোকও যখন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে লাগিলেন, তখন অনেকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল। তারপর ব্রাহ্ম মনীষীদের হাতে বাঙ্গালা গদ্যের সহজ সরল এবং কোন কোন ইংরেজি-শিক্ষিতের হাতে তাহার লঘুতরল রূপ দেখিয়া ইংরাজিনবীশদের শ্রদ্ধা আরও আকৃষ্ট হইল। গোঁড়া হিন্দুসমাজকে আঘাত করিবার জন্য তাঁহাদেরও বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার প্রয়োজন হইল।

বাঙ্গালা দেশে গদ্য-রচনার সূত্রপাতের সহিত নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির সম্পর্ক আছে।

১। মিশনারিগণের ধর্ম্মপ্রচার। ২। তাঁহাদের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন।

৩। মিশনারিগণের এতদ্দেশীয় লোকের রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ। ৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা। ৫। ধর্ম্ম-কলহ। ৬। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের বাণী-প্রচার। ৭। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের আক্রমণ ও ইউরোপীয় দার্শনিক মত প্রচার। ৮। রক্ষণশীল হিন্দুদের স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা। ৯। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা-প্রচার ও দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিবিধ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা। ১০। সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্ম-মত প্রচার। ১১। সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র প্রচার।

পূর্ব্বে গদ্যে কোন পুস্তক রচিত হইত না। গদ্যে চিঠিপত্র, দলিলপত্র ইত্যাদিই লিখিত হইত। পুস্তক রচনায় গদ্যের প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ, যে পয়ার ছন্দে চৈতন্য-চরিত ও বৈষ্ণব সাধুসন্তদের জীবনী লেখা হইত, তাহা নামে পদ্য হইলেও একপ্রকার গদ্যই। তাহা ছাড়া, যে যুগে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সে যুগে পদ্য এমন কি গানের সাহায্য ছাড়া বক্তব্য প্রচার করাই সম্ভবপর ছিল না। পদ্যে লেখা চলে না এমন বিষয়বস্তুরও অভাব ছিল। তাই বলিয়া গদ্যভাষা যে ছিল না তাহা নয়। মৌখিক গদ্যভাষা এমনি সহজ ও সরল ছিল যে অতি অল্পায়াসেই তাহাকে পয়ারে পরিণত করা যাইত। যে দেশে পদ্যের ভাষা এত সহজ সরল, সে দেশে গদ্যের ভাষা অনুরূপ হইতে পারে না। মৌখিক গদ্য বেশ সহজসরলই ছিল। আদালত সম্পর্কীয় ব্যাপারে এ ভাষা (ভারতচন্দ্রের কথায়) ছিল 'যাবনী মিশাল'—অর্থাৎ—সে ভাষায় আরবি ফার্সি শব্দের প্রাধান্য ছিল, কেবল পণ্ডিত সমাজে এ ভাষা ছিল সংস্কৃত-সমাস-সন্ধি-বহুল।

১৮শ শতাব্দীতে রচিত শূন্যপুরাণে গদ্য ভাষার নিদর্শন দেখা যায়। এই শতাব্দীতে কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দ্বারা অনূদিত হয়। এই গদ্য দুর্বোধ্য নয়। এই শতাব্দীতেই পোর্ত্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদরিরা বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। দোম এন্তোনিও নামে একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান হইয়া পোর্ত্তুগীজ পাদরিদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারে যোগদান করেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেন। পাদরিদের ভাষা ছিল চল্‌তি ভাষারই কাছাকাছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষণের প্রয়োজন হইল। তাহাদের জন্য বাংলা পুস্তক মুদ্রণেরও প্রয়োজন হইল। তাহার ফলে বাংলা হরফের সৃষ্টি। চার্লস্ উইলকিনস এই হরফের প্রবর্ত্তক আর পঞ্চানন কর্ম্মকার ইহার মিস্ত্রী। প্রথমেই ইংরাজি হইতে বাংলায় আইনগ্রন্থ অনূদিত

হইল এবং হ্যালহেড সাহেব বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিলেন। অশুদ্ধ হইলেও এই আইন গ্রন্থগুলির ভাষা দুর্বোধ্য নয়।

শ্রীরামপুরে যে মিশনারীদের আস্তানা ছিল, তাঁহারাই বাংলা গদ্যকে অনেকটা আগাইয়া দেন। ইঁহারা নিজেরাও বাংলা গদ্য লিখিতেন এবং মুন্সী-পণ্ডিতদের দ্বারাও বাংলা গদ্য লিখাইতেন। ইঁহাদের মুদ্রাযন্ত্র হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত মার্জ্জিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব নিজে দুইখানি গদ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং বাংলা-ইংরাজি অভিধান রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

খৃষ্টান পাদরি টমাস ও কেরি বাংলা ভাষাচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগ দেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারই ইঁহাদের বঙ্গভাষার অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহারা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের রচয়িতা রামরাম বসুর সাহায্যে যে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন—তাহা আসল বাংলাই বটে। ভাষার নমুনা—"যদি তোমরা মনুষ্যেরদিগের অপরাধ ক্ষমা করহ, তবে তোমারদিগের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদিগের অপরাধ না ক্ষমহ, তবে তোমারদিগের পিতা তোমারদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা উপবাস কর, তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণবদন হইও না, কেন না তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাইবার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে।" (অনুজ্ঞায় লাট হি-র হ চলিতেছিল এবং সম্বন্ধের বিভক্তির সঙ্গে দিগকে দিগের যুক্ত হইত)।

কেরি নিজে সংস্কৃত ও দেশীয় অন্যান্য ভাষা যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বাংলাভাষায় চমৎকার ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তবে তাঁহার রচনাবলীতে তাঁহার মুনশী রামরাম বসুর হাত কতটা আছে বলা যায় না। খৃষ্টীয় প্রার্থনার রূপ তিনি এইভাবে দিয়াছিলেন—

"হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদিগের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের অপরাধীরদিগকে মাফ করি সেই মত আমারদিগের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না, কিন্তু আমারদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর। কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য, শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।"

কেরি চলতি বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বাংলার গদ্যভাষাকে

আরবি, পারশি ও গ্রাম্য শব্দ হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তনে কেরির দান যথেষ্ট।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইলে বাংলা বিভাগের ভার লইলেন উইলিয়ম কেরি। তাঁহার সহকারী হইলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু ইত্যাদি ৮ জন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইঁহাদের মধ্যে রামরাম বসু ছাড়া অন্যান্য সকলের ভাষা সংস্কৃতানুগ হইলেও গুরুচণ্ডালিয়া দোষে দুষ্ট। মৃত্যুঞ্জয় ত সর্বজনবোধ্য ভাষাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—

"যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হ'ন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়বোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হয়েন।" (বেদান্তচন্দ্রিকার উপসংহার)

তারপর বাংলা গদ্য ভাষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া অনুস্বার-বিসর্গ-হীন সংস্কৃত হইয়া উঠিল। গদ্যভাষার এই রূপটি বাংলা দেশে কথক ঠাকুরদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কথকগণ ভাষাকে কণ্ঠস্বরের ও পদবিন্যাসের কৃত্রিমতায় তরঙ্গায়িত করিয়া তাহাদের বৃত্তির উপযোগী একটা পৌরাণিক ভক্তিগাম্ভীর্য্যময় পরিবেষ্টনী সৃষ্টির চেষ্টা করিতেন। সেজন্য তাঁহাদের একটা 'নবজলধরপটলী' ভাষার প্রয়োজন হইত। * কথকঠাকুরদের মুখের ভাষার যে একটা হিল্লোলিত মাধুর্য্য ছিল, তাহা বাদ দিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ ও মিশনারিদের নিযুক্ত পণ্ডিতগণ গদ্য ভাষাকে নীরস ও শব্দাড়ম্বরময় করিয়া তুলিলেন।

**রামরাম বসু**—ইনি রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ও লিপিমালা নামে দুইখানি পুস্তক লিখেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত মৌলিক গ্রন্থ। কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাকে বঙ্গভাষায় রচিত বঙ্গদেশের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

লিপিমালা পত্রাকারে লিখিত কতকগুলি নিবন্ধ। অধিকাংশই পৌরাণিক।

---

* "গোলোক চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে খেদ করুণ বাৎসল্য ইত্যাদি রস অবলীলাক্রমে উত্তম রাগ মান তালে যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিলে শ্রোতৃমাত্রই মোহিত হইতেন। তিনি ভাগবতীয় শ্লোকাদি অবলীলাক্রমে পাঠ ও তাহার মর্ম্মার্থ টীকাসম্মত ব্যাখ্যা করিতে পারেন।" (সংবাদ প্রভাকর ৬।১।৫০)

লিপিমালার ভূমিকায় বসুমহাশয় যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য ও ভাষার নিদর্শন দুইই মিলিবে। যথা—

"এক্ষণ এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা এদেশীয় চলনভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাঁহারদিগের আকিঞ্চন এখনকার চলনভাষাও লেখাপড়ার দ্বারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য-ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা পুস্তক রচনা করা গেল।"

রামরাম বসু গদ্যভাষার আদর্শ আকৃতি দিয়াছিলেন। অবশ্য সংস্কৃত না জানার জন্য তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে তাঁহার ভাষায় সংস্কৃত সমাসের প্রাচুর্য্য নাই বটে কিন্তু আরবি ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।

**রাজীবলোচন**—ইঁহার গদ্যপুস্তক মহারাজ 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'। ইহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকের নাম সংস্কৃত হইলেও ইহার ভাষা অতিরিক্ত পণ্ডিতী নয়। রামরাম বসুর ভাষার মত আরবি ফারসি শব্দের প্রাধান্যও ইহাতে নাই। লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলেও ভাষা সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই।

**চণ্ডীচরণ মুন্‌শী**—সংস্কৃত শুকসপ্ততির ফারসী অনুবাদ তুতিনামা, তাহার হিন্দী অনুবাদ তোতা কহানী, তাহার বাংলা অনুবাদ করেন মুন্‌শী মহাশয় তোতা ইতিহাস নামে। ইঁহার ভাষাও ছিল রাজীবলোচনের পুস্তকের মত। তোতার কাহিনীটি ফারসী ও হিন্দীর মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহার ফলে এই পুস্তকের ভাষায় অনেক ফারসী ও হিন্দী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি ইহার ভাষা ক স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল বলিতে হইবে।

**হরপ্রসাদ রায়**—ইনি বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষার বাংলা অনুবাদ করেন। ইঁহার ভাষা সংস্কৃতানুগ। কিন্তু দুর্বোধ নয। ভাষার নিদর্শন, "কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি। বীর এবং সুধী ও বিদ্বান আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত। যুগপৎ মানসিক উৎকর্ষ ও নাগর নাগরীদের হর্ষোৎপাদনের জন্য এই গ্রন্থ বিরচিত।" (পুরুষ পরীক্ষার ভূমিকা)।

**মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার**—ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উইলিয়ম কেরির অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন—পরে ইনি জজপণ্ডিত হ'ন। ইনি বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, বেদান্ত-

চন্দ্রিকা ও প্রবোধ চন্দ্রিকা এই কয়খানি পুস্তক রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় হইতেই প্রকৃত পক্ষে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ গদ্যভাষার সূত্রপাত। ইঁহার রচনায় সকল প্রকার গদ্য-ভঙ্গীরই নিদর্শন আছে। ইঁহার হিতোপদেশের অনুবাদের ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালার ভাষার অগ্রদূত।* এই যুগে হিতোপদেশের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল; এক গোলোকনাথ শর্ম্মার অনুবাদ ছাড়া কোনটি মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলিকে বাংলা ভাষায় প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ইহাতে তিন প্রকার ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। একপ্রকার অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ, একপ্রকার গ্রাম্য ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণে সহজপ্রাঞ্জল, আর একপ্রকার উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভাষা—বঙ্কিমের ভাষার অগ্রদূত তাহাকে বলিতে পারা যায়। প্রবোধ-চন্দ্রিকাতে এই তিন শ্রেণী ছাড়া চলিত মৌখিক রীতির কাছাকাছি রীতিরও নিদর্শন আছে। বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে ভাষারও তারতম্য ঘটিয়াছে। প্রাচীন বিষয় বা সংস্কৃত আবেষ্টনীর বিষয় লইয়া রচনাকালে এবং সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে ভাষা সংস্কৃতানুগ হইয়াছে। যেখানে বিষয় বর্ত্তমান জগতের এবং যেখানে বর্ণনীয় বিষয় বাঙ্গালীর সাধারণ ঘরসংসারের, সেখানে ভাষা সরল প্রাঞ্জল। এ ভাষা যেন টেকচাঁদের ভাষার অগ্রদূত। বেদান্তচন্দ্রিকায় মৃত্যুঞ্জয় উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন—ইহার ভাষা তদনুরূপ। এ বিষয়ে তিনি রামমোহনের সহযোগী ছিলেন, যদিও পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুতে ছিলেন প্রতিযোগী। কেহ কেহ বলেন—এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ই অগ্রণী। বাংলা গদ্যের ক্রমোন্মেষে মৃত্যুঞ্জয়ের দান অপরিসীম। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চন্দ্রিকাই বাংলা ভাষায় প্রথম সারগর্ভ গদ্য পুস্তক।

**গোলোকনাথ শর্ম্মা**—ইনি হিতোপদেশের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থও শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। গোলোকনাথ ভাল সংস্কৃত জানিতেন না—সে জন্য অনুবাদ যথাযথ হয় নাই—ভাষাতেও যথেষ্ট অশুদ্ধি আছে। তবে তিনি স্থলে স্থলে সম্পূর্ণ চলতি বাংলাতেও অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল ক্রিয়াপদগুলির রূপ চলতি নয়।

**ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়**—ইনি সমাচার-চন্দ্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

---

* কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র ও হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল; রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিল সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে বধ করিলেক।—ভাষার নিদর্শন।

ইনি প্রথমে রামমোহনের সংবাদকৌমুদী সম্পাদনে সহযোগিতা করিতেন—ধর্ম্মমত সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ইনি সংবাদকৌমুদীর সঙ্গ ছাড়িয়া সমাচার-চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন। ইঁহার নববাবুবিলাস, কলিকাতা কমলালয় ইত্যাদি গদ্যে পদ্যে রচিত পুস্তকে সেকালের সর্ব্ববিধ আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যাহারা সমাজের গ্লানি তাহাদের যেমন তিনি কশাঘাত করিয়াছেন—যাহারা সমাজ ভাঙ্গিতে চান তাহাদেরও তেমনি কশাঘাত করিয়াছেন। ভবানীচরণ হইতেই বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় কৌতুকরস-রচনার প্রারম্ভ। ইঁহার ভাষা কৌতুকরসের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না—কারণ, ভাষায় প্রাঞ্জলতা ছিল না। ইনি লোকশিক্ষার জন্যও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

**রামমোহন**—এ যুগে বাংলা গদ্যভাষার অন্যতম প্রবর্ত্তক রামমোহনের ভাষাও সংস্কৃতানুগ। একালের তুলনায় সংস্কৃতানুগ, কিন্তু সেকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় সহজ সরল। তাই গুপ্তকবি বলিয়াছিলেন—"দেওয়ানজি জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। তাহাতে কোন বিচার বা বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত।"

রামমোহন সাধ করিয়া ভাষাকে সংস্কৃতানুগ করেন নাই। আত্মমত-প্রচারের জন্য ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত বিতর্ক করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভাব-প্রকাশের ভাষা দার্শনিক তত্ত্বপ্রকাশের অনুকূল করিয়া লইতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, তিনি বেদান্ত, উপনিষদ্, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্ম-কথা বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। যুক্তি-পরম্পরার সাহায্যে তত্ত্বমূলক নিবন্ধ-রচনা-পদ্ধতির তিনিই প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টাই করেন নাই। সাহিত্যের ভাষাও তাঁহার লেখনীতে আসিত না। গুপ্তকবি তাই বলিয়াছেন "তাঁহার লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"

রামমোহন সাহিত্যিক নহেন, তিনি এদেশের জ্ঞানগুরু, স্বাধীন চিন্তার সুরধুনীধারার ভগীরথ। তিনি বেদান্ত-দর্শনের বঙ্গানুবাদ করেন। রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। রামমোহন বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে ইনি জ্ঞানাঞ্জন নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মকে সমর্থন করিতে থাকেন। নিম্নলিখিত অংশ হইতে রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ও তাঁহাদের ভাষার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের জ্ঞানাঞ্জন ( ২২, ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)। জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা।—

"সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শাস্ত্রানুশীলনপর ধর্ম্মধর্ম্মাবৃত সাধুজন সমাজেষু।

এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্ত্তৃক মান্য অথচ অনুচ্ছেয অনাদি পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিকধর্ম্ম, তাহা আধুনিক সামান্য কর্ত্তৃক অমান্য হইয়াছে। ইত্যবধানে রামনারায়ণপুর মথুরা নিবাসী শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায়-বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদযুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোকপরম্পরাকর্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম করণ এবং এই ধর্ম্মবিষয়ে স্বজাতীয় বিজাতীয় লোকসমূহ কর্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদসংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও সদযুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে যাথার্থ্যান্বেষণে কৃতযত্ন শ্রীযুত বাবু নীলরতন হালদারের বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা বহু যত্নে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্মবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন তাঁহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা নীর-পরিত্যাগী ক্ষীরভক্ষী হংসের ন্যায় দোষপরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন কিমধিকমিতি। শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কারস্য।"।

এই ভাষায় একটিও আরবি ফারসী শব্দ নাই। মিশনারি সাহেবদের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গদ্যভাষা রচিত হইয়াছিল তাহাতে আরবি ফারসী ও চলতি শব্দ বর্জ্জিত হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়রা ভাষাকে একেবারে যবনদোষমুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব এই পণ্ডিতমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাঠ্যপুস্তকগুলি এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। সেকালের অনেকগুলি সংবাদপত্রের ভাষাও এইরূপ কিংবা ইহার চেয়েও বেশি সংস্কৃতানুগ ছিল। ছাত্রদের পঠনপাঠনের জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয় এইরূপ ভাষায়। অক্ষয়কুমার এই ভাষারই মোটামুটি অনুসরণ করিয়া একটা বিশিষ্ট রূপ দান করেন এবং বিদ্যাসাগর এই ভাষাকেই মধুরায়িত ও হিল্লোলিত করেন।

দেশে নবপ্রবর্ত্তিত ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষা স্বাধীনচেতা রামমোহনের মনে প্রচলিত লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাইল—কোরানপাঠে এই অশ্রদ্ধা ঘনীভূত হইল। তিনি দেখিলেন, তখনকার হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের নামে কতকগুলি অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার ও পৌরোহিত্য-শাসন চলিতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঐ পুরোহিতদের ও সমাজ নায়কদের কোন পরিচয়ই নাই—স্বার্থ-সাধনের জন্য বিরচিত কতকগুলি অপশাস্ত্রের ও কুলাচার, লোকাচারের দোহাই দিয়া জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ-সমাজ সমগ্র জাতিকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া খৃষ্টান পাদরিরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ও গলদগুলি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে এবং খৃষ্টান সমাজের দলপুষ্টি করিতেছে। এইসময় রামমোহন প্রচার করিলেন—প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম লোকাচার, কুলাচার, স্মৃতি, পুরাণ, পুরোহিত-দর্পণ, পঞ্জিকা, কুলজি ঘটক-কারিকা ইত্যাদির মধ্যেও নাই—মঠ-মন্দির, ঢাক ঢোল, পূজা পার্ব্বণ হোমবলি, আহারবিহার, দানদক্ষিণা ইত্যাদির মধ্যেও নাই। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের কথা আছে—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা ও তন্ত্রে। তিনি বেদান্ত-সম্মত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন—দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতাকে অপধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি সমাজ-সংস্কার-সাধনে ও ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচারে সরকারকে প্রণোদিত করিয়া সহায়তা করিলেন।

এইভাবে যুগান্তর আনয়ন করিতে তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল—তাহার ফলে বাঙ্গালাভাষায় গদ্য-সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। * বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা ইত্যাদি পরাবিদ্যামূলক আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত

---

* তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পাঠকের সহিত গদ্য ভাষার পরিচয়ই ছিল না। সেজন্য বেদান্ত দর্শনের অনুবাদের প্রারম্ভে তিনি গদ্যভাষা বুঝিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। "এ-ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহা প্রত্যেক কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভূত হয়। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।"

বাঙ্গালী জাতির পরিচয়ই ছিল না। রামমোহনই এই সকলের সহিত বাঙ্গালী-জাতির পরিচয় ঘটান। ফলে, রামমোহনের সময় হইতে বঙ্গভাষায় ঐসকল শাস্ত্রের অনুবাদ, অনুশীলন ও বিচারের সূত্রপাত হইল এবং ঐসকল শাস্ত্র হইতে গদ্য বঙ্গভাষা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। রামমোহনের বেদান্তানুরাগের প্রতিবাদের জন্য মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করেন। তাহার উত্তরে রামমোহন লেখেন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'। রামমোহনের মতবাদের প্রতিবাদে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন লেখেন 'পাষণ্ডপীড়ন'। ইহার উত্তরে রামমোহন লেখেন 'পথ্য-প্রদান'। রামমোহনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য গৌরীকান্ত 'জ্ঞানাঞ্জন' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

রামমোহন যে অভিযানের সূত্রপাত করিয়া গেলেন—তাহা রামমোহনের মৃত্যুর সহিত লোপ পায় নাই—ক্রমেই তাহা আগাইতে থাকিল। গোঁড়া হিন্দুরাও নিশ্চেষ্ট থাকিল না—তাহারাও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হইল। ফলে, বাদপ্রতিবাদে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের পুষ্টি হইতে লাগিল। সভা-সমিতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, বক্তৃতা ও বিতণ্ডাকলার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাদানুবাদে দেশ মুখরিত হইল, নূতন নূতন সাময়িকপত্রের সৃষ্টি হইতে লাগিল, বহু প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে বাদানুবাদের জন্য রামমোহন ব্রাহ্মণ-সেবধি ও সংবাদ-কৌমুদী নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন।

**সাময়িক পত্র**—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (১৮০১ খৃঃ অব্দে) শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইহার সহিত বাংলা গদ্যরচনার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। মুখে মুখে বক্তব্য প্রচার করিতে হইত বলিয়া সকল বিষয়ই পদ্যে রচিত হইত। মুখে মুখে চালানোর পক্ষে ছন্দোবদ্ধ রচনাই প্রকৃষ্ট। গ্রন্থাকারে প্রচারের সুবিধা হওয়ায় গদ্য রচনার পদ্ধতি প্রবল হইয়া উঠিল। মুদ্রাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনের পর কেবল গ্রন্থ নয়, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি গদ্যভাষার পুষ্টি ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রবর্তিত মাসিক দিগ্‌দর্শন (১৮১৪) পরে সাপ্তাহিক সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হয়। 'দিগ্‌দর্শন' কেবল গদ্য ভাষার পুষ্টিতে নয়, শিক্ষাবিস্তারেও সহায়তা করিয়াছিল। সমাচার-দর্পণে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার গদ্য পদ্য দুইই লিখিতেন। * এই দুই পত্রিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ও দেশীয় সমাজ-

* মিশনারি কেরি সাহেবই জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা পরিমার্জ্জিত করাইয়া সর্ব্বপ্রথম কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত করেন। এই দুই গ্রন্থও গদ্যসাহিত্য রচনায় সহায়তা করিয়াছিল।

ধর্ম্মের সমর্থনের জন্য—রামমোহনের সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সমাচারচন্দ্রিকা। তারপর প্রকাশিত হয় বঙ্গদূত। ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন ও তাঁহার ঠাকুরবাড়ীর বন্ধুগণ। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর—এ যুগের প্রসিদ্ধ পত্রিকা, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ভাস্কর। তত্ত্ববোধিনী, সংবাদপূর্ণ-চন্দ্রোদয়, সংবাদ-দিবাকর, সংবাদ-সৌদামিনী, জ্ঞানান্বেষণ, তিমিরনাশক, সংবাদসুধাংশু, হরকরা ইত্যাদি পরে প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকার নামকরণ হইতে বুঝা যায়, দেশে জ্ঞান-প্রচারই সেকালের কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের সাময়িকপত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। দেশ অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ তাই প্রভাকর, ভাস্কর, চন্দ্র, সৌদামিনী ইত্যাদির আলোকের খুব প্রয়োজন ছিল। এইগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই প্রচলিত ছিল। গদ্যভাষার পুষ্টিসাধনে যে পত্রিকাগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তন্মধ্যে সংবাদপ্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর পরবর্ত্তী যুগে বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, বান্ধব, জন্মভূমি, সাধনা ইত্যাদি মাসিক পত্রগুলি গদ্য সাহিত্যের বাহন হইয়াছিল।

**হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল'**—রামমোহনের পর একটি নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আবির্ভাব হইল। ইহারা হিন্দু কলেজের ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের ছাত্রবৃন্দ। ইহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিষয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহাদের মতভেদ ছিল না। কিন্তু ইহারা ব্রাহ্মদের মত সংস্কারসাধন করিতে চাহেন নাই—ইহারা চাহিয়াছিলেন ধ্বংস করিতে অর্থাৎ ইহাদের প্রয়াস Reformative নয়, Iconoclastic. ইহারা হিন্দু সমাজকে অমান্য করিতে গিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য, চিন্তা, আহারবিহার, বেশভূষা ইত্যাদি সমস্তকেই অমান্য করিতে সুরু করিলেন। শুধু তাহাই নয়। ইহারা ঈশ্বর, পরলোক, লৌকিক পাপপুণ্য, নৈতিক আদর্শ—সমস্তকেই অস্বীকার করিতে লাগিলেন—সর্ব্ববিষয়ে ইহাদের আদর্শ হইল জড়বাদী ইউরোপ। ভারতবর্ষের সমস্তই ইহাদের কাছে হেয় ও বর্জ্জনীয় হইয়া পড়িল। কাজেই ইহাদের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মদিগকেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল।

**সাহিত্যে ব্রাহ্মপ্রভাব**—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদলের সেনাপতি হইলেন। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহার মারফতে নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিলেন। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদি তৎকালের

একেশ্বরবাদী আস্তিকের দল লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের পুষ্টি হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মসমাজ,—গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দু কলেজের বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমন্বয় ( Synthesis ) আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সভ্যতারও Synthesis এই ব্রাহ্মসভ্যতা। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ বিদ্রোহীদলের অনেককে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিল। কেবল হিন্দু কলেজের বিদ্রোহিদল নয়—সেকালে Locke, Hume, Bentham, Comte, Spencer ইত্যাদির দর্শনতত্ত্বের পুস্তক পড়িয়া হিন্দুসমাজের অনেকেই সংশয়বাদী অথবা অবিশ্বাসী ( Agnostic, Sceptic, Positivist কিংবা Atheist ) হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম প্রভাবে তাঁহারা Reformed Hindus নামে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলে ব্রাহ্ম হন নাই বটে—কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের সব কথা নির্বিচারে মানিয়া লইতে পারেন নাই,—যতটুকু যুক্তিবাদ ও সত্যবাদের দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ ও প্রাচ্যবিদ্যার সহিত পাশ্চাত্যবিদ্যার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া ইঁহাদিগকে আত্মবিবেকের তুষ্টিসাধন করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ সাহিত্যের পুষ্টি। ব্রাহ্ম প্রভাবে এদেশে স্বাধীন চিন্তার সহিত শাস্ত্রশাসিত হিন্দুসভ্যতার সমন্বয়সাধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গদ্য সাহিত্যে তাহারই প্রভাব সম্পাতিত হইয়াছে।

এদেশের নৈতিক আদর্শ অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল—রুচিও ছিল অত্যন্ত জঘন্য। ব্রাহ্মপ্রভাব সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বের সাহিত্য তাহার সাক্ষী। ব্রাহ্মপ্রভাবে সাহিত্যে সুরুচি ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির দল ও হাফআখড়াই দলের পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরগুপ্তও ব্রাহ্ম প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগবতী কবিতাগুলি ব্রাহ্মভজনালয়েরই প্রতিধ্বনি। ব্রাহ্মাচার্য্যগণের মতই তিনি কাব্যে নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তাঁহার অধিকাংশ রঙ্গব্যঙ্গ রচনা সুরুচির মর্য্যাদা অতিক্রম করে নাই। রাম-নারায়ণ পণ্ডিত যে নাটকে কৌলীন্য ও হিন্দুসমাজের অন্যান্য অনাচারগুলি লইয়া ব্যঙ্গ করিতে পারিয়াছিলেন - তাহাও ব্রাহ্ম প্রভাবে। তাঁহার অনুবর্ত্তী দীনবন্ধু মাঝে মাঝে সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাটকা-বলীতে নৈতিক আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তিনি নৈতিক আদর্শের মর্য্যাদাও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর ব্রাহ্মপ্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগরের রচনা পাঠ করিয়া কেহ যদি তাঁহাকে ব্রাহ্ম মনে করেন—তবে বিস্ময়ের কারণ দেখি না। তাঁহার রচনায় দেবদেবীর নামগন্ধও নাই, পৌত্তলিকতার কোন প্রভাব নাই, তিনি পূরামাত্রায় নবপ্রবর্ত্তিত সুরুচি ও সুনীতির মর্য্যাদা ব্রাহ্ম লেখকদের মতই রক্ষা করিয়া চলিযাছেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বংশধর ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কিন্তু রচনার কোথাও ব্রাহ্মণ্য অভিমান নাই। বহু বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন অভিযান চালাইয়া গিয়াছেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি কি ভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা সকলেই জানেন। যে দুর্নিবার স্বাধীন চিন্তার ধারা তাঁহার রচনায় দৃষ্ট হয়—তাহা তিনি হিন্দুসমাজ হইতে পান নাই, হিন্দু কলেজ হইতেও পান নাই, পাইয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হইতে।

অক্ষয় কুমার দত্ত ত নিজেই ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল আদর্শ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া প্রচার করিযা গিয়াছেন। কোন নিবন্ধে তিনি সেকালের ব্রাহ্মজন-সুলভ ভাগবতী ভক্তি ও একেশ্বরবাদের মহিমা প্রচার করিতে ভুলেন নাই। পাছে পাঠক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে অন্ধ জড় শক্তির অভিব্যক্তি মনে করিয়া সংশয়বাদী বা জড়বাদী হইযা উঠে, সেই আশঙ্কায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-রচনাকালেও তিনি মুহুর্মুহুঃ ভগবানের মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসু নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন—তাঁহার রচনা ব্রাহ্ম প্রভাবে যে পুষ্ট হইবে—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাঁহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন গোঁড়া হিন্দুর সন্তান। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাকে Reformed Hinduর দলের গুরুগোসাঁই বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কোন আচার আচরণকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, প্রত্যেকটিকে তিনি সার্ব্বজনীন সত্য ও যুক্তিবাদের কষ্‌টি পাথরে কষিযা তবে গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেব বাবু যে যুগে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—সে যুগে শাস্ত্রের বা লোকাচারের প্রতি অন্ধ ভক্তির দোহাই দিয়া বাণীপ্রচারের যুগ নয়। হিন্দুয়ানী লইয়া যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস তাঁহার রচনার কোথাও নাই। ব্রাহ্ম প্রভাবই তাঁহার লেখনীকে সংযত ও যুক্তিমূলক পরম্পরার পথে পরিচালিত করিয়াছিল। যুক্তির দ্বারা আমাদের সমাজের যে

অঙ্গ বা আচারকে বাঁচাইতে পারিয়াছেন, তিনি প্রবন্ধে তাহারই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। *

**প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত**—স্বদেশের ও বিদেশের ধর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার কথা দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য এবং বিদেশী ও স্বদেশী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বাদানুবাদের জন্য এ দেশে প্রথম গদ্য প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। পদ্যের অনুক্রম আবেগাত্মক, গদ্যের অনুক্রম যুক্তি মূলক। যখনই যুক্তি-পরম্পরার প্রয়োগে বক্তব্যকে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই গদ্য প্রবন্ধের প্রয়োজন হইয়াছে। রামমোহন হইতেই গদ্য প্রবন্ধের সূত্রপাত।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ছিল ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। এই পত্রিকার মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বমূলক গদ্যপ্রবন্ধের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদেশী শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব বস্তু পাইলাম বিজ্ঞানে। তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত দেশের লোককে সর্ব্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখিলেন। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্ম ছিলেন। বিজ্ঞানের সহিত চিরকালই ভাগবত বিশ্বাসের বিরোধ আছে। বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার ধর্ম্মভাবের একটা সংঘর্ষ ঘটিল। অক্ষয়কুমার তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে ভাগবত মহিমার সহিত বৈজ্ঞানিক রহস্যের সমন্বয় ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য-বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতার সহিত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশল ও মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জড় জগতের রহস্য ভেদের জ্ঞান লাভ করিয়া পাছে লোকের ভগবানে বিশ্বাস টলিয়া যায়, সেজন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না।

* বঙ্কিমচন্দ্রও ব্রাহ্ম প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। গীতার বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতেই পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি উপন্যাসে যে রুচি ও নীতির উচ্চাদর্শ ও ভাষার শুচিতা রক্ষা করিয়াছেন—তাহা ব্রাহ্ম প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি যে স্বাধীন চিন্তা, সত্য দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, আবেগোচ্ছ্বাস সংবরণ, যুক্তি মূলক ক্রম ইত্যাদির পরিচয় দিয়াছেন,—তাহাতে ব্রাহ্মপ্রভাবই সূচিত হয়। তিনিও ছিলেন রিফর্মড হিন্দু দলের একজন। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তিনি এথিকস্‌কে লজিকের এর দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন এবং উপকথা ও অলৌকিক কাহিনীর খাণ্ডবরন পরিষ্কার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের ঐতিহাসিক বেদিকার উপর শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়াছেন।

ক্রমে বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও জীবনাদর্শ এদেশে গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইল। তখন বিদেশীয় ভাবচিন্তা ও তাহাদের অভিঘাতে সদ্যোজাত ভাবচিন্তাগুলি দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য ইংরাজী শিক্ষিত মনীষিগণ গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য লোকশিক্ষক। ইঁহাদের স্বতই একটা ধারণা জন্মিল—দেশবাসীর প্রতি ইঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, অন্ততঃ লোকশিক্ষাবিষয়ে ইঁহাদের একটা দায়িত্ব আছে। বাঙ্গালী জীবন নানা কুসংস্কারে ও ভ্রান্ত ধারণায় অবিল হইয়া আছে। তাহার চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও সত্যের সন্ধান করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু ভ্রান্ত, যাহা কিছু যুগজীর্ণ, যাহা কিছু সংশয়াত্মক, তাহা দূর করিবার জন্য ইঁহারা শৃঙ্খলিত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রবন্ধে বিলাতী তত্ত্বজ্ঞগণের যুক্তি ও বাণীর দোহাই যতটা দিয়াছেন—আমাদের শাস্ত্রকারগণের নজীর ততটা ব্যবহার করেন নাই। বিদেশী তত্ত্বজ্ঞগণের নজীর, সাক্ষ্য ও যুক্তিতে ইঁহাদের প্রবন্ধ সমাকীর্ণ। বিদেশী তত্ত্বজ্ঞগণের প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। প্রাচীন ভারতের ভাবচিন্তাগুলিকেও ইঁহারা যুক্তিমূলক শৃঙ্খলায় ব্যক্ত করিয়া জাতীয় গৌরব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও চেষ্টা একেবারে করেন নাই তাহা নয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থরাশি মন্থন করিয়াও ইঁহারা স্বমতের সমর্থন খুঁজিয়াছেন।

দেশে বিদেশী সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা প্রচারিত হইল, স্কুলকলেজ স্থাপিত হইল, দেশের লোকের জ্ঞান-পিপাসা বাড়িতে লাগিল, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়িতে লাগিল, জাতীয়তাবোধ প্রবুদ্ধ হইল, জনমত-গঠনের প্রয়োজন হইল, রসবিচার ও সমালোচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

এই সকল কারণে ছাত্রশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনার প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন কবি—সেজন্য তাঁহার প্রবন্ধে অনেকটা গদ্যপদ্যের সমন্বয় হইয়াছিল। প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার প্রসার তাঁহার প্রভাকর হইতেই,—এই ধারা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের রচনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই ধারা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবুদ্ধি ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে হৃদয়াবেগের স্থান নাই—ইহা জ্ঞানমার্গমূলক বৈদান্তিক ধর্ম্ম। ফলে, এই

ধর্ম মূলতই গদ্যাত্মক। ব্রাহ্মধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে গদ্যের প্রসার বাড়িতে থাকে। বিদেশী শিক্ষাও শৃঙ্খলিত চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদেশী শিক্ষার ফলে দেশে চিন্তাশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইল। এই চিন্তাশৃঙ্খলা ও ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিমূলক বুদ্ধিশ্রী দেশে সমাজ-সংস্কারের স্পৃহা এক দিকে যেমন নাট্যসাহিত্যে রূপ লাভ করিল, অন্যদিকে তেমনি প্রবন্ধ রচনায় প্রবুদ্ধ হইল। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর পত্রিকাতে সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধ রচিত হইতে লাগিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তন, দেশের অশিক্ষামোচন ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য যুক্তিমূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে বাধ্য হইলেন।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা ছিল বড়ই সাংঘাতিক। প্রথম যাঁহারা ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিলেন, তাঁহারা বিশেষতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম, সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনকে ঘৃণা করিতে শিখিলেন,—তাঁহাদের অনেকে ঈশ্বর মানিতেন না—কেহ বা খৃষ্টান হইলেন—কেহ বা মেম বিয়ে করিলেন। যিনি খুব শান্ত শিষ্ট লোক তিনি হইলেন ব্রাহ্ম। ইঁহারা গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানকে সভ্যতার অঙ্গ মনে করিতেন—কোন প্রকার নীতির বন্ধনে থাকাকে কাপুরুষতা মনে করিতেন। *

পক্ষান্তরে ইঁহারা সুশিক্ষিত, প্রতিভাবান্, স্বাধীনচেতা ও গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন। ইঁহাদের দ্বারাও বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকেই ঘৃণা করিতেন। ইঁহারা ভাবিতেনও ইংরাজীতেই। ভূদেববাবু ইঁহাদের দলে মিশেন নাই—বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাহার ফলে বঙ্গভাষা তাঁহার সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। মাইকেল এই দলেরই একজন পাণ্ডা। আমরা মাইকেলকে হারাইয়াছিলাম—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুমতি হইল, তাই তিনি "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" ইত্যাদি স্বীকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মত প্রতিভা কাহারও ছিল না সত্য, কিন্তু ভূদেবের মতন প্রতিভা অনেকেরই ছিল। তাঁহারা বঙ্গভাষাকে ঘৃণা না করিলে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট লাভ হইতে পারিত। ইঁহারা সাময়িকপত্রে যে নিবন্ধগুলি লিখিতেন, সেগুলি বাংলায় লিখিলে দেশের প্রবন্ধ-সাহিত্য যথেষ্টরূপে সমৃদ্ধ হইতে পারিত।

* ইঁহাদিগকেই ব্যঙ্গ করার জন্যই দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ চরিত্র অঙ্কন করেন। রাজনারায়ণবাবু সেকাল ও একাল নামক পুস্তকে, যোগেন্দ্র বসু মাইকেলের জীবন চরিতে ও শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন-চরিতে ঐসকল প্রতিভাশালী উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন।

যাঁহারা এই সময়ে বঙ্গদেশের সমাজ, ধর্ম্ম ও গতানুগতিক লোকযাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন—তাঁহারা সকলেই হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর শিষ্য ও তাঁহার একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভ্য। ইঁহারা সকলেই সংস্কারমুক্ত চিত্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন। সত্যই ইঁহাদের উপাস্য ছিল—সত্যই ছিল ইঁহাদের ব্রহ্ম। ইঁহাদের মধ্যে এক প্যারীচাঁদ মিত্র ছাড়া অন্য কেহ প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টিতে মন দেন নাই। ইঁহাদের অধিকাংশ রচনা ছিল ইংরাজীতে। রচনা অপেক্ষা রসনার উপর ইঁহাদের আধিপত্য বেশী ছিল। বক্তৃতার মধ্য দিয়াই ইঁহারা ইঁহাদের অধিকাংশ বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। সাহিত্যরচনা না করিলেও ইঁহাদিগকে বঙ্গভাষাতে কিছু কিছু লিখিতে হইয়াছিল। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বার্থসংগ্রহ নামে একটি মহাকোষ রচনা করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক জ্ঞানান্বেষণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহার অর্দ্ধাংশ বঙ্গভাষায় রচিত হইত। শিবচন্দ্র দেব শিশুপালন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান (প্রেততত্ত্বের পুস্তক) নামে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। তারাচাঁদ, টেকচাঁদ ও রামগোপাল ঘোষের উৎসাহে যে বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রকাশিত হইত তাহার অর্দ্ধাংশও বাঙ্গালায় রচিত হইত। রাধানাথ শিকদার প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় 'মাসিকপত্র' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রবর্ত্তিত ভাষাকে ইঁহারা অস্বাভাবিক বাঙ্গালা বলিয়া মনে করিতেন। এ ভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা নয়—ইহাতে বাঙ্গালীর অন্তরের কথা প্রকাশিত হইতে পারে না—ইহাই ছিল ইঁহাদের বিশ্বাস। সাহিত্যসৃষ্টিই ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না—ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালার নিজস্ব জাতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা। প্যারীচাঁদ মিত্র—কেবল এই ভাষার দাবি পেশ করিয়াই তুষ্ট হন নাই। তিনি এই ভাষায় একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে হরিনাথ মজুমদার মহাশয় বিজয়বসন্ত নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—তাহা সংস্কৃতানুগ অস্বাভাবিক ভাষায় রচিত। উহাকে খাঁটি বাঙ্গালার উপন্যাস বলা যায় না।

**ভাষার ক্ষেত্রে যুগান্তর**—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা শিক্ষকদের কোন কোন পুস্তক হইতেই চলতি ভাষার একটা ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল, চলিত ভাষায় পুরা একখানি বই লেখার সাহস কাহারো হয় নাই। আলালের ঘরের দুলাল হইতেই বঙ্গভাষার নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। কালীপ্রসন্ন

সিংহের হুতোম পেঁচার নক্সা এই ভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আলালী ভাষার তুলনায় এই ভাষা গ্রাম্যতাদুষ্ট।

আজকাল বিদ্যাসাগরী ভাষা আর চলে না। সে কালেও ঐ ভাষাকে ইংরাজি শিক্ষিত দল ও অল্পশিক্ষিত দল আদর্শ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন নাই। সেকালের অনেক সাময়িকপত্রে বিদ্যাসাগরী ভাষা লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলিত এবং শিক্ষিত সমাজেও ঐ ভাষা লইয়া হাস্য পরিহাস চলিত। আলালী ভাষা ঐ ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ ভাষায় ঘরসংসারের ও লৌকিক জীবনের কথার অনায়াস প্রকাশ সম্ভব হইত—কিন্তু উচ্চস্তরের চিন্তা, অতীত ভারতের কথা বা দেশবিদেশের কথা প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। সেজন্য ঐ ভাষাও সাহিত্যে চলিল না। তখন দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা সন্ধি হইল। এই সন্ধি হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বিদ্যাসাগরী ভাষাতেই উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পরে বুঝিতে পারিলেন—এ ভাষা প্রবন্ধে বরং চলিতে পারে—কথাসাহিত্যে চলে না! তখন তিনি বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষার একটা সমন্বয় ঘটাইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আলালী ভাষাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাষা নয়। ইহার জন্ম পণ্ডিতী ভাষার প্রতিক্রিয়ায়। পণ্ডিতী ভাষার বিপরীত বৃত্তক্রান্তি দেখাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া টেকচাঁদ সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত শৈলী, সংস্কৃত আবহাওয়া সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং জোর করিয়া গ্রাম্য, আরবী, ফারসী, অপ্রচলিত দেশী শব্দ সকল খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। এ যেন হরিজন উদ্ধারের পর্ব্ব, এ যেন গোঁড়ামির প্রতিশোধ লওয়ার জন্য চামারচণ্ডাল সবারই গলায় পৈতা পরাইয়া দেওয়া। এই বিদ্রোহের ভাষা সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা নয়। সেজন্য দুই Extremeএর একটা Golden Mean এর বা একটা সামঞ্জস্য বা Synthesis এর প্রয়োজন হইয়াছিল। বঙ্কিম এই কার্য্যটি করেন। যাঁহারা শান্ত সংযত প্রকৃতির লেখক—গোঁড়ামি বা ভাঁড়ামি দুইই যাঁহাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত ছিল না—তাঁহারা, যেমন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু ইত্যাদি মনীষীরা স্বাভাবিক ভাষাতেই লিখিতেন।

**ঈশ্বর গুপ্ত**—তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যে যখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র যুবকমাত্র; সেই সময় হইতে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রভাকরে' কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত কতক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, [illegible], মনোমোহন বসু,

দ্বারকানাথ প্রভৃতির সাহিত্যগুরু। 'প্রভাকরে' সেই সময়ে কবিতার মধ্য দিয়া তরুণ লেখকদিগের বাগ্‌যুদ্ধ ও রসকলহ হইত; তাহাকে সকলে 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' বলিত।

"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কোন বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল না, তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা জানিতেন না; এবং তাঁহার মতও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাপন্ন ছিল। তথাপি বিংশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া তিনিই বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন। ব্যঙ্গ ও রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এবং এই গুণেই তিনি কি কবি, কি সম্পাদক, উভয় রূপেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।"—বাঙ্গালা সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র।

গুপ্ত কবির গদ্য রচনায় শব্দের ঘটা ও অনুপ্রাস যমকের ছটাই ছিল খুব—বক্তব্যের সারবত্তা বা অর্থগৌরবের অভাব ছিল। পল্লববাহুল্যে পুষ্প যেন প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেজন্য গদ্যরচয়িতা বলিয়া গুপ্তকবির কোন খ্যাতি নাই, যদিও তিনি গদ্যে পদ্যে সব্যসাচী ছিলেন। উভয় ধারাতেই তিনি সেকালের লেখকদের শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছিলেন।

**বিদ্যাসাগর**—বিদ্যাসাগরকে ঠিক সাহিত্যস্রষ্টা বলা যায় না। ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী ও শিক্ষাব্রতী। তিনি বাঙ্গালা গদ্য ভাষাকে যে অবস্থ পাইয়াছিলেন তাহাতে ব্যাকরণের দিক হইতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, বাক্য-গঠন ও পদবিন্যাসের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না এবং বাক্যে কোন সৌষ্ঠব ছিল না। তাহা ছাড়া সন্ধি সমাস-ঘন বাক্যের মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য শব্দ ও আরবি পারসি শব্দের মিশ্রণ ছিল। বাক্যগুলি গাঢ়বদ্ধ ছিল না—তাহার মধ্যে ওজন-বোধেরও পরিচয় ছিল না।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছেন, বাঙ্গালার নিজস্ব বিভক্তিগুলির ইংরাজি ও ছেদগুলির সুনিয়মিত প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার হাতে বাঙ্গালা গদ্য একটি স্বচ্ছন্দ, সৌষ্ঠবময় ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিল। তিনি বাক্যের সর্ব্বাংশে একটা সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও সৌষম্য সৃষ্টি করেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নয়। জনতা নিজকেই খণ্ডিত ও প্রতিহত করিতে থাকে। তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর গদ্য-ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্য্যকুশলতা

দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব-প্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যে নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন।"

বঙ্কিম প্রথম জীবনে বিদ্যাসাগরী রচনা-শৈলী অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এইরূপ সুমধুর গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং পরেও কেহ পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর নিজে সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না। কিন্তু সাহিত্যিকদের অভিভাবক ও গুরুস্থানীয় ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার নিকট যে শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য পাইয়াছিলেন—তাহা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে পাইবার কথা নয়। মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহাকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে অমিতাচারী, দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী হইলেও তাঁহার জন্য তিনি নিজে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি সেকালের সাহিত্যরথিগণ সকলেই তাঁহার নিকট নানা ভাবে ঋণী।

নিজে মৌলিক সাহিত্য রচনা না করিয়াও তিনি দেশবাসীকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-দের রচনার সহিত পরিচিত করাইতে চাহিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তররাম চরিত অবলম্বনে তিনি যে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন তাহা মৌলিক রচনার মতই উপাদেয়। ঈসপের ব্যঙ্গার্থ-গর্ভ গল্পগুলির তিনি অনুবাদ করেন। শেক্সপিয়ারের কোন কোন নাট্যের উপাখ্যানও তিনি বঙ্গ-ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

বিদ্যাসাগর একজন নিবন্ধকারও ছিলেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন, বহুবিবাহ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন ইত্যাদির জন্য তিনি অনেক যুক্তি-গর্ভ নিবন্ধও রচনা করেন। তাঁহার 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' নামক নিবন্ধ সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে।

তাঁহার সারস্বত জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্রত ছিল দেশের লোককে ভাষা-শিক্ষা দান। এ বিষয়ে তিনি হাতে খড়ি হইতে গুরুগিরি করিয়াছেন। বর্ণ-পরিচয় ১ম ভাগ হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত গ্রন্থরচনা দেশবাসীকে দস্তুরমত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা হইতে এজন্য তিনি বহু আখ্যায়িকা, গল্প, উপাখ্যান ইত্যাদি সংকলন করিয়া বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত

করেন। সেগুলি সাহিত্য না হইলেও সাহিত্যরচনায় ও সাহিত্যের রসবোধে দীক্ষাদানের কার্য্য করিয়াছে।

এখন কথা হইতে পারে, শিক্ষা-প্রচারই যাঁহার ব্রত তাঁহার ভাষা সর্ব্বজন-বোধগম্য হওয়া উচিত ছিল না কি? একথা অক্ষয়কুমার সম্বন্ধেই খাটে। কারণ, তিনি দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞানাদি বিবিধ-বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার ভাষা সর্ব্বজনবোধ্য হওয়া উচিত ছিল। বিদ্যাসাগর ভাষা-শিক্ষাই দিতে চাহিয়াছিলেন—যে ভাষা সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী, সেই ভাষাই তিনি শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। যে ভাষায় লোকে সাধারণতঃ ভাব প্রকাশ করে, যে ভাষা তাহাদের পূর্ব্বেই অধিগত, সে ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া লাভ কি? তাহা ছাড়া, তিনি চাহিয়াছিলেন সাহিত্যবোধে দীক্ষা দান করিতে। সর্ব্বজনের উচ্ছিষ্ট ভাষায় তাহা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ দেশীয় সাহিত্য বলিতে বিদ্যাসাগর বুঝিতেন সংস্কৃত সাহিত্য। সে সাহিত্যে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিতে হইলে সংস্কৃতানুগ সরস ভাষারইত প্রয়োজন। তাঁহার নিজস্ব শিক্ষাভিজাত্যের সহিত অন্য ভাষার সামঞ্জস্যও হইত না।

**অক্ষয়কুমার দত্ত**—ইনি একজন ভাষাশিল্পী, শিক্ষাব্রতী ও নিবন্ধকার ছিলেন। রেভঃ কৃষ্ণমোহনের মত ইনিও একজন লোকশিক্ষক ও ধর্ম্মগুরু। ইনি সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিতেন—বিদ্যাসাগরের ভাষার মত ইঁহার ভাষা সৌষ্ঠবময় ও সাবলীল ছিল না। ইঁহার ভাষা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু, নীরস ও জটিল। অক্ষয়কুমার আমাদিগকে বিদেশীয় বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মদর্শন ইত্যাদির সহিত পরিচিত করান। তিনি এজন্য অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' ইংরাজি ভাষা হইতে সংকলিত একখানি ব্যবহারিক জ্ঞানের পুস্তক। চিন্তাগর্ভ বিচারমূলক নিবন্ধ হিসাবে ইহার মূল্য অসাধারণ। তিনি দেশী বিদেশী বহু উপাদান হইতে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিবরণ ও দ্বন্দ্বসমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি অক্ষয়কুমারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। বিবিধ উপাসক সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণা করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় দুই শত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠানের কথা আছে। বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণামূলক রচনা বোধ হয় ইহাই প্রথম। 'প্রাচীন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' অক্ষয়কুমারের আর একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ। ইনি প্রথমে সংবাদপ্রভাকরের একজন লেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্য্যেই

ইঁহার সাহিত্যে দীক্ষা। বহুদিন ধরিয়া তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মালোচনা-বিষয়ে সহায়তা এবং তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুক্তি অনুসরণ করিয়া নিবন্ধরচনার প্রবর্ত্তনে তিনি গুরুস্থানীয়।

প্রকৃত সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা তিনি বুঝিতেন না তাহা নয়। তিনি জানিতেন যে সরস করিয়া না বলিতে পারিলে কোন নিবন্ধ সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। তাই তিনি Addison এর Vision of Mirzaর অনুসরণে স্বপ্নদর্শনচ্ছলে বিদ্যা, নীতি, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রূপকের অন্তরালে সত্যপ্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অক্ষয়কুমার সেকালের সাহিত্যিকদের চিন্তা-বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার তিনভাগ চারুপাঠ অদ্যাবধি ভাষা শিক্ষার বাহন হইয়া আসিতেছে।

**মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ**—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও মহর্ষি অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগরের মত সমাস-সন্ধিঘন সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিতেন না। তাঁহার রচনার প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্ম্ম। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা শাস্ত্র-গবেষণা নয়, শাস্ত্রীয় বাদবিচার, তর্কদ্বন্দ্বও নয়—তিনি স্বধর্ম্মকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন—তাঁহার নিজস্ব ধর্ম্মানুভূতি ও ভাগবতী ভক্তির কথাই তিনি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। সত্যানুভূতির ভাষা কখনও অস্বচ্ছ, জটিল বা আড়ম্বরময় হয় না। তাঁহার অনুভূত ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যানগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম্ম', 'কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা', 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' ইত্যাদি গ্রন্থে উপনিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালা-ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার আত্মজীবন-চরিত তাঁহার জীবনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাস—সত্যনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মমূলক গদ্যসাহিত্য-রচনায় তাঁহার পিতার নিকট ঋণী।

**রাজনারায়ণ বসু**—ইনি মাইকেল, ভূদেব ইত্যাদি রথিগণের সতীর্থ ছিলেন। কাজেই ইনি ছিলেন ইংরাজি-নবিশ। ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইনি সংস্কৃতানুগ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইনি নিজে সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না—কিন্তু সাহিত্য-রসিক ছিলেন। ইঁহার ভাষা সরল,—সাহিত্য রচনার ভঙ্গীতেই ইনি নিবন্ধাদি রচনা করিতেন। ইঁহার দৃষ্টি ছিল কৌতূহলী ও রসাত্মক। রসদৃষ্টিতে ইনি চারিপাশে যাহা কিছু দেখিতেন—তাহাই সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেন। ইঁহার আত্মজীবন-চরিত ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ইঁহার প্রাণটি ছিল যেমন স্বচ্ছ—ইঁহার ভাষাও ছিল তেমনি স্বচ্ছ। ইনি রচনার মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধ জাগরণের চেষ্টা করেন। সত্যনিষ্ঠ লেখক নিজের জীবনের ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটী—এমন কি ছাত্রজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথাও অকুণ্ঠিতভাবেই লিখিয়া গিয়াছেন।

**ভূদেব মুখোপাধ্যায়**—ইনিও ঠিক সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না—শিক্ষাব্রতী, জ্ঞানগুরু ও নিবন্ধকার ছিলেন। এডুকেশন গেজেটের মারফতে ইনি নিজের চিন্তা, মন্তব্য ও অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিতেন। শিক্ষাব্রতী বিশেষতঃ লোকশিক্ষক হিসাবে ইনি সংসারীদিগকে সংসারধর্ম্মের নৈতিক শৃঙ্খলা শিক্ষাদান করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ ইত্যাদি পুস্তকে আদর্শ-গৃহি-জীবন পালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ আছে। প্রাজ্ঞ মনীষী তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দেশবাসীকে আদর্শ চরিত্রগঠন ও আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন যাপনে শিক্ষাদান করিয়াছেন। ভূদেব শিক্ষাবিষয়েও অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি একজন ঐতিহাসিকও ছিলেন—তাঁহার পুরাবৃত্তসারে বহু দেশ বিদেশের ইতিহাস সঙ্কলিত আছে। ভূদেবের ভাষা ছিল অনেকটা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

হিন্দুকলেজের দূষিত ছোঁয়াচ তিনি এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উৎকট গোঁড়ামিও ছিল না। তিনি হিন্দু সংস্কারগুলিকে যুক্তির দ্বারা অথবা যুগোপযোগী ব্যাখ্যান দানে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন—তাঁহার বিচারনিষ্ঠ মন বিনা যুক্তিতে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—'পঞ্চাশোর্দ্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'—অনুশাসনটির ব্যাখ্যা। ভূদেব 'বনের' অর্থ ধরিয়াছেন পুত্র পৌত্রের মায়া কাটাইয়া স্বগৃহ হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে বসতি। যুক্তিমূলক চিন্তায় তিনি বঙ্কিমের অগ্রদূত ছিলেন।

তিনি একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন—এই উপন্যাসও শিক্ষাব্রতীয় উদ্দেশ্যই বহন করিতেছে—কারণ ইহা নীতিমূলক। তাহা হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও ইঁহাকে অগ্রদূত বলা যায়। ভূদেব ছিলেন আদর্শ সংসারী। হিন্দু সংসারী লোককে তিনি তাঁহার নিবন্ধগুলির মারফতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা অমূল্য। ভূদেব সর্ব্বব্যাপারে সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিলেন শিক্ষক। ভূদেববাবুর রচনাভঙ্গী সংস্কৃতের কঠোর বন্ধন হইতে অনেকটা মুক্ত।

**টেকচাঁদ ঠাকুর** (প্যারীচাঁদ মিত্র)—ইনি খাঁটি বঙ্গ-ভাষাকে সংস্কৃতের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ইনিই প্রথম দেখাইলেন—যে খাঁটি চলতি ভাষাতেও বই লেখা চলে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। তাঁহার

'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'এত দিনে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল।' †

বঙ্কিমচন্দ্র চতুষ্পাঠীব লেখকদের পরাভবে উৎফুল্ল হইয়াই একথা বলিয়াছিলেন—প্রকৃত পক্ষে তিনি এই ভাষা নিজে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, এই ভাষায়—বর্ত্তমান কালের সাধারণ জীবন-যাত্রার কথাই ব্যক্ত করা যায়—গুরুতর বিষয়, তত্ত্বমূলক প্রসঙ্গ, দেশের নানাবিধ সমস্যার কথা, দেশে ও কালে দূরবর্ত্তী বিষয় এই ভাষায় আলোচনা করা যায় না।—তবু এ ভাষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কথাগুলিও আগে চতুষ্পাঠীব লেখকগণ আড়ম্বরময় ভাষায় ব্যক্ত কবিতেন। তাহা যেমন অস্বাভাবিক—তেমনি অসত্য। জাতীয় জীবনের ও জনসাধারণেব জীবন-যাত্রার সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যের যত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিবে—ততই এই ভাষার প্রয়োজন হইবে।

যে যুগে গদ্যে মৌলিক রচনার চেষ্টাই ছিল না—কেবল বিদেশী সাহিত্য অথবা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনুবাদ বা মর্ম্মানুবাদ চলিতেছিল—সে যুগে টেকচাঁদ এমন একটা সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন—যাহা ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ মৌলিক। এজন্য যাঁহারা বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী বা মৌলিকতাব পক্ষপাতী, তাঁহারা 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িয়া বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। বঙ্কিম তাই বলিয়াছেন—

"তিনিই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরাজির উচ্ছিষ্টাবশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজির কাছে ভিক্ষা কবিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর নয়। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয় তবে বাঙ্গালা দেশের বিষয় লইয়া সাহিত্য গড়িতে

† বঙ্কিম যে এ কথা বলিয়াছিলেন—তাহা পণ্ডিত-লেখকদের প্রতি বিরক্তিবশতঃ। তিনি নিজে বিদ্যাসাগরী ভাষা-শৈলীরই তখন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতেন। ঐ ভাষা শৈলী অনুসরণে পুস্তক লিখিয়াও তিনি পণ্ডিতদের তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার অনেক ভুল ধরিয়াছিল—ব্যাকরণের দোষ দেখাইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল।" *

সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের ধনিসন্তানদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি কশাঘাতে দূর করার জন্য টেকচাঁদের আগ্রহ যতটা প্রবল ছিল—খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টির মনোভাব তাঁহার ততটা ছিল না। তবু ইহাতে একটা লাভ হইয়াছিল। বাস্তব চিত্র অঙ্কন না করিলে কশাঘাত করা চলে না, সংস্কারের পন্থা দেখানোও চলে না। সেইজন্য টেকচাঁদকে আদর্শবাদ, স্বপ্নবিলাস, গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া রীতিমত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিতে হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবতার প্রবর্ত্তন তাঁহার একটি বড় দান। সে যুগে এই বাস্তবতার মূল্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ছাড়া আর কেহ বুঝিতেন না। চিত্রের যে চিত্রহিসাবেই একটা মূল্য আছে—চিত্র কেবল পরিবেষ্টনী সৃষ্টির জন্য অথবা গল্পের কথাবস্তুর পোষকতার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়—একথা টেকচাঁদ প্রথম বুঝাইলেন। বিচিত্র না হইলেও যথাযথ চিত্রের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। চিত্র ফুটাইবার জন্য টেকচাঁদ যে বাগ্‌বিনিময়ের সমাবেশ করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার নাটকীয় মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। টেকচাঁদী রীতি এই বাগ্‌-বিনিময়ের দ্বারা পরবর্ত্তী উপন্যাস ও নাটকগুলির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

**চল্‌তি ভাষা**—টেকচাঁদের আগেও গদ্যরচনার প্রারম্ভ কাল হইতেই চলিত ভাষায় একটা ধারা চলিয়া আসিতেছিল। তবে তাহার মূল্যমর্য্যাদা শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হয় নাই।

* আলালের ঘরের দুলালের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে দেওয়া গেল :—

বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু, বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হ'রে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই একজন ভট্টাচার্য, বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন।.........একপাশে দুইজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে; তানপূরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। একপাশে মুহুরীরা খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জ্জদার, প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে—অনেকের দেনা-পাওনা ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে থই-থই করিতেছে।.........খুচুরা খুচুরা মহাজনেরা, যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা—তাহারাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—"মহাশয়, আমরা মারা গেলাম,—আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন ক'রে বাঁচিতে পারি?" এই ভাষা-ভঙ্গী আমরা বঙ্কিমের শেষ বয়সের রচনায় দেখিতে পাই।

রামরামবাবুর ভাষা সংস্কৃতানুগ নয়, নিতান্ত চলিত ভাষাতেও তিনি লেখেন নাই। সেকালের বাক্যগঠনগত অমার্জ্জিত ভাব বাদ দিলে ও ব্যাকরণাশুদ্ধি বর্জ্জন করিলে রামরাম বাবুর ভাষা একালের সাধু ভাষারই অনুরূপ। যেমন—তোমার খুল্লতাতের তোমার গমনাবধি দুঃখের সীমা নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোন কার্য্যে আমোদ নাই ইহার পূর্ব্বমত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় খিদ্যমান। —প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকরা সংস্কৃতানুগ রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের ভাষা সন্ধিসমাসে সমাকীর্ণ ছিল না। মিশনারি সাহেবরা চলিত বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন। কেরি সাহেব নিজে দুই শ্রেণীর ভাষাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার 'কথোপকথন' পুস্তকে বাগ্‌বিনিময়ের পাত্রপাত্রী যেমন, তাহাদের মুখের ভাষাও তেমনি। যেমন—

—মুই সে বাড়ীতে কাম করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কাম করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগাম এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

আচ্ছা ভাই। ইহা কর যদি তবে মুই যাব।

ইতিহাসমালায় তিনি প্রায় বর্ত্তমান সাধুভাষারই অনুসরণ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ও প্রয়োজনমত সাধুভাষা ও চলতি ভাষা দুইই লিখিতেন। তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা—

"স্ত্রী বলিল গুড় হইলেই কি রাঁধা যায় তৈল নাই নুন নাই চাউল নাই তরকারিপাতি কিছুই নাই। কাঠগুলি সব ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হইবে। কুটনা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে।"

"মোরা চাষ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব। ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটে কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাকপাত শামুক গুগলি সিঝাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা

কক্ষী তুঁষ ও ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা কব্জি ফুঁড়ি পিঁজি পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফল ফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাথায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সীদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বানি দিই ও তেল নুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া গনি ধান কুড়াই সিজাই শুকাই ভানি খুদকুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি। তেল বিহনে মাথায় খড়ি উড়ে।" (প্রবোধ চন্দ্রিকা)

ক্রিয়াপদগুলি সবই মার্জ্জিত ভাষার। ক্রিয়াপদগুলির কথা বাদ দিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও চলতি ভাষার।

"আর এখন কি হবে বল দেকি রে ঠেঁটা বেটা তখন ফাঁকিফুকি দিয়া নামাইলি এখন যে মু'খ কথা নাহি তোর অহঙ্কার কোথা গেল হারে বেটা বোকা রাজাকে যে ধমক করিয়াছিলি এখন যাও না।"

(গোলোকনাথ শর্ম্মার হিতোপদেশ।)

গ্রীকদেশে একজন পণ্ডিত অবিবোধে কালযাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন মিত্রদের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। ইহা দেখিয়া মিত্রেরা কহিল একি আপনি ইহাকে যে কিছুই কহিলেন না। পণ্ডিত কহিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি গর্দ্দভের নিকট যায় এবং গর্দ্দভ চাইট মারে তবে কি গর্দ্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে।

(ক্ষমাশীল পণ্ডিত, সংবাদ কৌমুদী)

**সংস্কৃতানুগ ভাষা**—যাঁহারা বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তয়িতা, তাঁহাদের ভাষাতো সংস্কৃতানুগ নয়; তবে গদ্যভাষা সংস্কৃত সন্ধিসমাসে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল কেন? যখন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখনই ভাষা কৃত্রিম রূপ পরিগ্রহ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনকাল পর্য্যন্ত এই কৃত্রিম ভাষার আধিপত্য চলিয়াছিল। তারপর বঙ্কিমের প্রৌঢ়কাল হইতেই ভাষা ক্রমে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল।

বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থায় মৌলিক রচনার খুবই অভাব। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গদ্য লিখিতে শিখিলেন, কিন্তু তখনও সাহিত্য সৃষ্টি করিবার শক্তি কাহারো বড় ছিল না। মৌলিক-চিন্তা বা গবেষণা করিবার শক্তি, প্রবৃত্তি বা অবসরও ছিল না। ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা বন্যার মত আসিয়া পড়িয়াছিল—

তাহাকে আত্মস্বীকৃত করিবার জন্যই লেখকরা ব্যস্ত ছিলেন। এ দিকে এত কাল সংস্কৃত পুস্তক সংস্কৃতেই পড়ানো হইত; সাধারণ লোকে সংস্কৃত পুস্তকের স্বাদ লাভ করিত না। প্রকাশের ভাষা পাইয়া পণ্ডিতমহোদয়গণও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সেকালের ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তাঁহারাও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইতেই চাইতেন। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গেলেই ভাষা সংস্কৃতের অনুগামী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সেকালের পণ্ডিতদের ভাষা যে অনুস্বারবিসর্গবিহীন সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার একটি কারণ ইহাই। ইংরাজি হইতে যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন—তাঁহারাও পরিচিত ও প্রচলিত শব্দের দ্বারা ইংরাজির ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া সংস্কৃত সন্ধি সমাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ফলে, তাঁহাদের ভাষাও সংস্কৃতানুগ হইত। সকলেই যে আক্ষরিক অনুবাদ করিতেন তাহা নয়; অনেকে ভাব বা কথাবস্তু গ্রহণ করিয়া কতকটা নূতন ভাবে অনুবাদ্য গ্রন্থের রূপান্তর দান করিতেন। এই অনুবাদনের ধারা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া তারাশঙ্কর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে যে সাহিত্যিক ধারা চলিতে থাকিল—সে ধারার লেখকরা মৌলিক সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনুবাদে মন দেন নাই।

সেকালের সংবাদ পত্রগুলিতেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরই কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য ছিল। সেজন্য অধিকাংশ সংবাদপত্রের ভাষা ছিল সংস্কৃতানুগ। পণ্ডিত মহাশয়দের হাতেই পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার পড়িয়াছিল। সেজন্য সেকালের বহু পাঠ্যপুস্তকের ভাষাও সংস্কৃতানুগ। পৌরাণিক বিষয় বিবৃতিতে কথকতার ভাষার ধারা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলেও সংস্কৃতানুগ ভাষার প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

**কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**—ইনি একজন বিখ্যাত দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান পাদরি হ'ন। ইনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য লেখনী ধারণ করেন। ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম ১৩খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, নীতিবিদ্যা জীবনচরিত ইত্যাদি বহুবিষয়ের সন্দর্ভ আছে। ষড়্‌দর্শনের তত্ত্বালোচনা করিয়াও ইনি ষড়্‌দর্শন সংবাদ নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইনি সংবাদসুধাংশু নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচনার ভাষা পণ্ডিতদের ভাষার তুলনায় সহজ সরল। ইঁহাকে সাহিত্যিক না বলিয়া লোকশিক্ষক বলিতে হয়।

**রামনারায়ণ তর্করত্ন**—ইঁহাকেই বাংলার আদিনাট্যকার বলা হয়। যদিও ইঁহার আগেও ২।৩খানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হইয়াছিল এবং ২।১খানি

পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছিল। তর্করত্নও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম সামাজিক নাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্বের জন্যই রামনারায়ণ এদেশে নাট্যগুরু। কৌলীন্য-বিকৃত সমাজের সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি রচিত। আমাদের সমাজে গলদের সীমা ছিল না—কাজেই রামনারায়ণ-প্রদর্শিত পথে ক্রমে বহু নাট্য রচিত হইতে থাকিল। রামনারায়ণ হইতে গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত নাট্যকারগণ সমাজসংস্কারের জন্যই নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের রীতিধারাই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

**রামগতি ন্যায়রত্ন**—রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিবৃত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু লোক-সাহিত্যও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে সে সমস্তের পরিচয়ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বিধিবদ্ধ কোন ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া যান নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ই সেই সকল উপাদান অবলম্বনে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি দুইখানি উপকথার পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন—একখানির নাম রোমাবতী, অন্যখানি ইলছোবা।

**তারাশঙ্কর তর্করত্ন**—ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি কাদম্বরীর অনুবাদ। বিদ্যাসাগর যেমন শকুন্তলা নাটক অবলম্বন করিয়া বাংলায় শকুন্তলা রচনা করিয়াছিলেন—তারাশঙ্কর তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত কাদম্বরীর আখ্যান বস্তু লইয়া বাংলায় অভিনব কাদম্বরী রচনা করিয়াছেন। মূল কাদম্বরীর পদবিন্যাসের ঘটা ইহাতে নাই—কিন্তু মূলের আলঙ্কারিকতা পণ্ডিত মহাশয় যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত অলঙ্কার প্রয়োগের আদর্শ এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিকতার ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

**রাজেন্দ্রলাল মিত্র**—ইনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতন একজন লোকশিক্ষক ছিলেন। ইনি সেকালের শিক্ষার্থীদের জন্য কেবল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন নাই—ইনি বিবিধার্থসংগ্রহ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন—ইহাতে বহু বিষয়ের নিবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষণার ইনিই পথিপ্রদর্শক।

ইহাদের অনেকের রচনা আজ বিলুপ্ত। কিন্তু ইহাদের রচনাবলীর সাহায্যেই আমাদের গদ্যভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে।

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (বাং ১২১৩—১২৬৫) আবির্ভাব। ইঁহার রচনায় প্রাচ্য যুগ শেষ হইয়া পাশ্চাত্য যুগের সুরু হইয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ইঁহার রচনায় নাই, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। গুপ্তকবির অনেক রচনা তাঁহার সাময়িক গ্রাম্য সাহিত্যেরই মার্জ্জিত নাগরিক রূপ। রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাবও দৃষ্ট হয়,—ছন্দের বৈচিত্র্যে নয়, শব্দালঙ্কারের (শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাসাদির) ঘটায়। গানগুলিতে সেকালের শাক্ত কবিদেরই অনুসৃতি দৃষ্ট হয়। গুপ্তকবির রচনায় রসের নিবিড়তা নাই,—তবে রূপের বৈচিত্র্য আছে। অধিকাংশ রচনাই বর্ণনাত্মক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারে জাতীয় জীবনে একটা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ঘটায় গুপ্তকবি বিষয়বস্তু ও আখ্যানবস্তুর বিস্তৃত পরিসর ও বৈচিত্র্য পাইয়াছিলেন। অনেক কবিতা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্রহ্মপ্রভাবে যে সকল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইত, গুপ্তকবির কবিতাগুলি সেই আলোচনারই যেন ছন্দোবদ্ধ রূপ।

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা তখন আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে একটা তুমুল আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। গুপ্তকবির কাব্যে সেই আলোড়নের সাড়া পাওয়া যায়। ইংরাজ-শাসনে আমাদের সামাজিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটে—তাহা গুপ্তকবিকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কৌতুকরসের উপকরণ যোগাইয়াছিল। আবার ইংরাজের বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি এদেশের লোককে চমকিত ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই বিস্ময়ের বিস্ফারিত ভাব গুপ্তকবির অনেক কবিতায় বাণী রূপলাভ করিয়াছে।

গুপ্তকবির রচনায় বহু আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক ও নৈতিক তথ্য থাকিলেও,—ভাবের গভীরতা, মনস্তত্ত্বের জটিলতা বা রসের নিবিড়তা নাই। সকল তত্ত্ব তথ্যের উপর দিয়া তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী লঘু পদে সঞ্চরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের মত তিনি কোন একটি উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন নাই—যখন যাহা তাঁহার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়াছে তখনই তিনি তাহা লইয়াই পদ্য লিখিয়াছেন। পরং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তপসে মাছ, পাঁটা, আনারস পর্য্যন্ত অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বের কিছুই বাদ যায় নাই। ধর্ম্মকথা ছাড়া বিচিত্র বিষয় লইয়া নানা রসের রচনা গুপ্তকবি হইতেই সুরু হইয়াছে। গুপ্তকবি

যুগ-সন্ধির কবি। তাই তাঁহার রচনায় পূর্ব্বতন কবিদের রুচি, রীতি, ভাবভঙ্গী, শব্দচ্ছটা, বস্তুতান্ত্রিকতা, বর্ণনাবিলাস, নির্ঘণ্টরচনা ইত্যাদি বিদ্যমান আছে—আবার বর্ত্তমান যুগের গীতিকাব্যেরও পূর্ব্বাভাস তাঁহার রচনায় দৃষ্ট হয়। বাংলা কবিতাকে গুপ্ত কবিই প্রথম ধর্ম্মসাহিত্যের কঠোর শাসন বিশেষতঃ পৌরাণিক আবেষ্টনী হইতে মুক্তি দেন।

গুপ্তকবি তখনকার রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যা অবলম্বনেও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। 'প্রভাকরে' যে রাষ্ট্রীয় ঘটনা বা জাতীয় সমস্যা লইয়া গদ্যে আলোচনা করিতেন—তাহা লইয়া ব্যঙ্গের সুরে পদ্যও লিখিতেন। এই কবিতাগুলিতে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তকবিই প্রথম দেশমাতা বলিয়া নূতন একটি দেবতার আবিষ্কার করেন। বাঙ্গালা কবিতায় গুপ্তকবিই সর্ব্বপ্রথম দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেন। তিনি গদ্য ও পদ্যে মাতৃভাষার মহিমাও প্রচার করেন। জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় স্বরূপবর্ণনাও গুপ্তকবির লেখাতেই সুরু হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে গুপ্তকবি—হিন্দুর বিশেষ বিশেষ দেবদেবী ছাড়িয়া—এক সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং খৃষ্টান কবিদের মত তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ-সাহিত্যে ভগবানকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিলেন। গুপ্তকবির ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, তিনি সগুণ হইয়া পিতৃত্বলাভ করিয়াছেন। কবি নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার হইতে আবেদন জানাইয়াছেন—

হায় হায় কব কায় ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হ.য় তুমি হলে কালা।
অনুভবে বুঝিলাম তুমি কালা বটে।
নতুবা কি আমাদের এত দুঃখ ঘটে?
চলিবার শক্তি নাকি কিছু ন'ই আর।
বি-পদ হইলে তুমি বিপদ আমার।
যে শুনিছে সে হাসিছে কারে আর ক'ব।
কেমনে বুঝাব আমি কর নাই ভব।
কহিতে না পার কথা কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার।

গুপ্ত হয়ে গুপ্তপুত্রে ছল কেন কর।
গুপ্তকায় ব্যক্ত করি গুপ্তভার হর।

গুপ্তকবি অনেক অধ্যাত্মতত্ত্ব, নীতিসূত্র, দার্শনিক তথ্যও পদ্যে প্রচার করিয়াছেন, এইগুলি লোকশিক্ষার জন্য পরিকল্পিত। ব্যঙ্গকৌতুক-রচনায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নূতন ধরণের কৌতুকরস-রচনা তিনিই প্রবর্ত্তন করেন—তখনকার গ্রাম্য রসিকতার তুলনায় তাহা অনেকটা মার্জ্জিত ও শিষ্টরুচিসঙ্গত। গুপ্তকবি প্রধানতঃ রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবি। নিরপেক্ষ উদাসীন দ্রষ্টার উচ্চাসনে বসিয়া তিনি চারিপাশের জগৎকে এবং মানবের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যকে কৌতুকদৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন। এই দৃষ্টিটাই বঙ্গসাহিত্যে অভিনব। ইহা প্রকৃত রসশিল্পীর দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকে তিনি রসসৃষ্টিতে পরিণত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অভিনব দৃষ্টির প্রবর্ত্তক হিসাবে তিনি গুরুস্থানীয়। এই ব্যঙ্গরস-রচনার দিক হইতেই দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের ইনি গুরুস্থানীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলার কাব্য সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, হরপার্ব্বতীর কাহিনী, আগমনী-বিজয়া ও কোন কোন পৌরাণিক কাহিনী। মঙ্গলকাব্যের গল্প লইয়া আর কাব্য রচনা করা হইত না। ইংরাজের আগমনের পর হইতে এ দেশের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য ঘটিল—কাব্যের বিষয়বস্তুও বাড়িয়া গেল। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আমরা সর্ব্বপ্রথম বিবিধ বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাই। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে।—দেবদেবীর প্রাধান্য ঘুচিয়া এক ভগবান সাহিত্যে উপাস্য হইয়া উঠিল—ধর্ম্মমতে বেদান্ত-উপনিষদের প্রভাব সঞ্চারিত হইল—তাহার ফলে ধর্ম্মজগতে নূতন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব হইল। দুর্নীতির সংস্কার চেষ্টার ফলে সুনীতি প্রচারও একটা বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজি সভ্যতার ও ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশে নব নব ভাব, বস্তু, প্রতিষ্ঠান ও আচারের প্রবর্ত্তন হইল। এইগুলিও হইল অভিনব বিষয়বস্তু। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মারফতে সেকালে সংঘটিত প্রত্যেক ঘটনাটি প্রচারিত ও আলোচিত হইত। সেগুলিও অভিনব বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তাহা ছাড়া, সাময়িক-পত্রিকার মারফতে ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের নব নব রূপও অনুকরণ ও অনুবাদের সাহায্যে প্রচারিত হইল। সেগুলি হইতেও কাব্যের বিষয়বস্তু কত প্রকারের হইতে পারে—তাহাও জানা গেল। এমন সব বিষয়বস্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আমরা পাই, সে সকল যে কখনো কবিতার

বিষয়ীভূত হইতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বের কবিদের ছিল না। এইভাবে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অনেকটুকু আগাইয়া দিয়াছিলেন। গাহিবার জন্য শুধু নয়, পড়িবার জন্য কবিতা বহুকাল পরে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম লেখেন।

ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যে কোন চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই—কোন ভাবকে বিগ্রহদান বা মূর্ত্তিমান করেন নাই। তিনি স্নেহ-প্রেম-করুণার কবি ছিলেন না—কোন গাঢ় বা গূঢ় অনুভূতির সাড়া তাঁহার কবিতায় নাই। সমগ্র জগতের সাহিত্যের বিচারে তিনি বড় কবি নহেন—সর্ব্বকালের বিচারেও তিনি বড় কবি নহেন, এমন কি প্রাচীন বঙ্গের কবি-বিচারেও তিনি খুব বড় কবি নহেন—বঙ্গদেশের কোন এক সময়ের বিচারেই তিনি বড় কবি অর্থাৎ বাংলা দেশে তাঁহার সময়ে তাঁহার চেয়ে বড় কবি কেহ ছিল না। ভারতচন্দ্র হইতে মাইকেল পর্য্যন্ত যে শতাব্দী, সেই শতাব্দীতে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বাঙ্গালী সমাজ তাঁহার সময়ে যেমনটি ছিল—তিনি ঠিক তাহারই প্রতিনিধি কবি। দেশে ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হইযাছিল—মুষ্টিমেয় ইংরাজিশিক্ষিত কয়েকজনকে এবং প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় আর কয়েকজনকে বাদ দিলে বাংলাদেশে যে ভদ্রসম্প্রদায় থাকে—সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা সেকালে যাহা চিন্তা করিত, অনুভব করিত, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত, গুপ্তকবি তাহাকেই তাঁহার কাব্যে রূপ দান করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি বাংলার কোন এক সময়ের জাতীয় কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—যাহা কাল্পনিক নয়, প্রকৃত বা বাস্তব, যাহা অনুমিত নয় প্রত্যক্ষ, যাহা উদ্ভাবিত নয় প্রাপ্ত, তাহার যথাযথ বর্ণনায় একটা রস আছে।

অবশ্য কেবল যথাযথ বর্ণনা ফোটোগ্র্যাফির মত হইয়া পড়ে—আর্ট হয় না। গুপ্ত কবি এই যথাযথ বর্ণনার মধ্যে একটা প্রসন্ন ব্যঙ্গপরিহাসের ফল্গুধারা বহাইয়াছেন। এই ফল্গুধারাই বর্ণনাগুলিকে সরস করিয়াছে—তাঁহার বাচনভঙ্গীই আলোকচিত্রকে রঙ্গিন করিয়াছে—কবির মৃদু-মৃদু হাস্যই বাস্তবের রক্তমাংসে লাবণ্যসঞ্চার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায় রান্নাঘরের ধুঁয়ায় নাটুরে মাঝির লগির ঠেলায় নীলের দাদনে হোটেলের খানায় পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরসও পান। তপসে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বিভাব দেখেন, পাঁটায় বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন তোমাদের এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথাকোটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর। আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওরে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর

কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠহাসি হাস, ওখানে মিছাকান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে। উভয়কে মুখ ভেংচানোতেই সুখ। স্ত্রীলোকের রূপ আছে তাহা তোমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে, উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পাড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘমাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র যাইতেন তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য। * * * স্থূলকথা ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য—ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।"

ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গ করিবার জন্য ব্যঙ্গ করিতেন, আঘাত দিবার জন্য নয়, সংস্কারের জন্যও নয়, বিদ্বেষপ্রচারের জন্যও ত নয়ই। ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, সমাজবিশেষ, প্রথাবিশেষ, প্রতিষ্ঠানবিশেষই তাঁহার লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"মেকির উপর তাঁহার রাগ ছিল বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটাই আনন্দ।"

তখন বাংলার পল্লীতে কবির লড়াই চলিতেছিল। তিনি কবিওয়ালাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নাগরিক সমাজে কবির লড়াইএর একটা মার্জ্জিত রূপ দিয়াছিলেন 'সংবাদ প্রভাকরে'। কবির লড়াইয়ের গালাগালি ব্যঙ্গবিদ্রূপে যেমন নিছক রঙ্গ ছিল, 'সংবাদ প্রভাকরের' তথাকথিত কবির লড়াইয়ে তিনি সেইরূপ একটা রঙ্গ সৃষ্টিই করিতেন বা করাইতেন।

কবির লড়াইএর রুচিও তাঁহার রচনায় সংক্রমিত হইয়াছিল, সে জন্য তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে অশ্লীলতা দেখা যায়। যে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুমাত্র অশ্লীলতা সহ্য করিতে পারিতেন না—তিনি তাঁহার অশ্লীলতা-দোষটুকু সমর্থন করিবার জন্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন—গুপ্তকবি দেবতুল্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সংসারের সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্য হইতে আবাল্য বঞ্চিত। তাহার ফলে সমাজসংসারের প্রতি তাঁহার ছিল মজ্জাগত আক্রোশ। সেকালে আক্রোশ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল—তাই তাঁহার রচনায় অশ্লীলতা মার্জ্জনীয়। বঙ্কিমের ঐ যুক্তি ছাড়া আর একটা কথা আছে। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মপ্রভাবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বাক্যের রুচি হইয়া উঠিয়াছিল

অতিরিক্তরূপ মার্জ্জিত। রামমোহন রায় এ দেশে এত বাদানুবাদ তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটি কুরুচিকর শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার আদর্শই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে চলিতেছিল। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কেহ সুরাপায়ী, কেহ সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজী, কেহ স্বজাতিদ্রোহী, কেহ স্বধর্ম্মদ্রোহী, কেহ নাস্তিক, কেহ আভিজাত্যের গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কেহ সাহেব বনিয়া গিয়াছে, কেহ বা ভণ্ড। এই নাগর সম্প্রদায়ের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের শ্রদ্ধা ছিল না—সেজন্য ইচ্ছা করিয়াই বিশেষ করিয়া তাহাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি তাহাদের বাগ্‌ভঙ্গীর বিরুদ্ধরুচির অনুসরণ করিতেন, খাঁটি গ্রাম্য হিন্দু বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই ব্যবহার করিতেন। তাহার ফলে রচনায় কিছু কিছু অশ্লীলতা আসিয়া পড়িত।

ভণ্ডদিগকে গালি দিতে গিয়া তাঁহার ভাষণে কপট শাসন ছিল না। তাহা ছাড়া, গুপ্তকবি ভারতচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন আদর্শরূপে। তাহাতে ধারণা জন্মে—অশ্লীলতা রসসৃষ্টিরই একটা অঙ্গ। এই ধারণাতেই তিনি বাক্য সম্বন্ধে সতর্ক হ'ন নাই। যাহাই হউক, তাঁহার অশ্লীল রচনাগুলি তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

ভাষার পারিপাট্য-সাধনে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য, কিন্তু শ্লেষযমক অনুপ্রাসে ভাষা অনেকস্থলে অপ্রচ্ছন্ন। ভারতচন্দ্রও শ্লেষযমক অনুপ্রাস প্রয়োগ করিতেন—কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুবিবেচিত প্রয়োগ—কলাসৃষ্টির অনুকূল। গুপ্তকবি এ বিষয়ে দাশুরায় ইত্যাদি পাঁচালিকারদের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। পাঁচালিকাররা শ্লেষযমক অনুপ্রাসের প্রয়োগকেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন—তাহাদের অন্য কোন সম্বল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বল ঢের বেশি ছিল। তিনি কেন যে পাঁচালিকারদের রীতি অনুসরণ করিতেন—তাহা বুঝা যায় না। ভারতচন্দ্রের রচনায় অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার অভাব শব্দালঙ্কারের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আনারস কবিতাটির আরম্ভ অতি সুন্দর, তার পর আনারসের 'আনা' কথাটি লইয়া এতই বাড়াবাড়ি করিলেন যে কবিতাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্যও হইয়া উঠিল না।

এইরূপ হেমন্তের খাদ্য কবিতায় কই ও কুল লইয়া বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেখানে যেখানে তিনি শব্দালঙ্কারের সংযত কিংবা সুবিবেচিত প্রয়োগ

করিয়াছেন, সেখানে সেখানে বাক্য সরস ও স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ কয়েকটি বাক্য—

১। শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে।
২। সাত পাত ভাত মারি ভ্যাভ্যা রব শুনে।
৩। বিবিজান চলে যান লবেজান করি।
৪। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।
৫। কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার
শস্যশিরে দৃশ্য ভাল উষার তুষার।
বর্ষ যায় হর্ষ তায় পরিপূর্ণ আশা
ক্ষেত্র প্রতি নেত্র পাত সুখে করে চাষা।
৬। কলাই থাকিলে ঘরে, বালাই কি আর ?
৭। শিশির সময়ে দেখ কৃষীর কুশল
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল ॥
৮। পলিত কুন্তল জাল গলিত দশন।
লোলিত গাত্রের চর্ম্ম স্খলিত বচন।

গুপ্তকবির রচনায় একটি দোষ—নিঃশেষ করিয়া বক্তব্য প্রকাশ, ব্যঞ্জনার অবকাশ না রাখা। তাহার ফলে বহু পদ্যই তালিকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের মত অর্থালঙ্কার রূপকেরও ছড়াছড়ি ছিল গুপ্তকবির কাব্যে।

এক সংসারের সঙ্গেই ভোজবাজি, জাঁতা, সমুদ্র, কানন, সাজঘর, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি কত বস্তুর যে রূপক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রূপক কোথাও কোথাও শ্লিষ্টরূপক—অধিকাংশ স্থলে ক্লিষ্টরূপক (strained metaphor)।

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিকে আদর্শ ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—রামপ্রসাদ যেমন এদেশে মাতৃভাবে উপাসনার প্রবর্ত্তক, ঈশ্বর গুপ্ত তেমনি ভগবানের পিতৃভাবের উপাসনার প্রবর্ত্তক। খৃষ্টানরা ও ব্রাহ্মরা ভগবানকে পিতৃসম্বোধন করিত। কিন্তু তাহাতে পিতাপুত্রের স্বাভাবিক গভীর বাৎসল্যভাবের পরিচয় ছিল না। এই পিতা প্রভুরই মতন। গুপ্তকবির কবিতায় ভক্তির গাঢ়তা ও আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এইরূপ পিতার প্রতি স্নেহানুরক্ত পুত্রের যে মধুর ভক্তিভাব, ভাগবত কবিতায় তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গুপ্তকবির সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তিনি কেবল কবিতা পড়িয়া নয়, জীবনের আচরণ হইতেও জানিতেন যে তিনি যথার্থই ভক্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহার রচনা পড়িয়া বুঝি—তিনি ছিলেন উদাসী ও অনাসক্ত পুরুষ। ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি না থাকিলে কেহ সমাজসংসারের মধ্যে কূটস্থ থাকিয়া মানুষের সুখদুঃখ উত্থানপতন জয়পরাজয়ে সমভাবে ঔদাস্যের হাসি হাসিতে পারেন না। তিনি বেদান্ত পড়িয়াছিলেন—তাহার নিদর্শন বহু কবিতাতেই বর্ত্তমান। এই বেদান্ত তাঁহার জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল—বেদান্তের মধ্যে তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবি-দৃষ্টির মূলে আছে। এই সৃষ্টি যে জগদিন্দ্রজাল, এ সংসার যে মায়াময় পাঁচ ভূতের খেলামাত্র, গুপ্তকবি বহু কবিতায় তাহা নানাভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন—

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাঁক।
পোষাকের দাম মোটা জুতা পায়ে তেড়ি ওঠা
কপালে জুড়িয়া ফোঁটা শোভা করে নাক।
বসনে বিচিত্র সাজ কাবায় রঙিন কাজ
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাঁক।

গুপ্তকবি ইংরাজি জানিতেন না—জানিলেও জানিতেন কাজচলা-গোছের। তাহার ফলে ইংরাজি সাহিত্যের ভাবভঙ্গী তিনি বাংলা কবিতায় আনিতে পারেন নাই—কিন্তু তাহাতে একটা লাভ হইয়াছে ইংরাজিতে ভাবিয়া তর্জ্জমা করিয়া তিনি বাংলা লেখেন নাই। অন্যদিকে সংস্কৃতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না, তাহার ফলে জটিল সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরও তাঁহার রচনায় নাই। খাঁটি বাংলা ভাষাতেই তাঁহার ভাব অনুভূতির প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। খাঁটি বাঙ্গালীর ভাষা ইহার পর কাব্যে আর মিলিবে না। গুপ্তকবির খাঁটি বাংলাভাষা ও বাচনভঙ্গীর নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি চরণ এখানে তুলিয়া দিই—

১। কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেটভরে খাব থাবা থাবা।
২। উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।

৩। ঝোলা গুড় তোলা ছিল শিকের উপরে
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে।

৪। মণ্ডাচোষা দধিচোষা জলচোষা যত
কোষা ধরা গোসাভরা জপেজপে রত।
প্রভাতে উঠিয়া সব মিছে ফুল তুলে,
পূজার আসনে ব'সে মন্ত্র যায় ভুলে।

৫। শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ ক'রে খায়।

এই ভাষা ব্যঙ্গ-রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গুপ্তকবি যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়াই লিখিতেন, বিশেষতঃ রঙ্গ-কবিতায়। পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছেন—ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদের মুখে ভাষা যোগাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

আজকাল সমাজ-সচেতনতাকে বড় কবির লক্ষণ বলা হয়। সে হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত বড় কবি। সে যুগের ইংরাজশাসনেব কথা, ইংরেজ সদাগর ও বড় সাহেবদের আচার-আচরণের কথা এবং ইংরাজের অধীনে দাসত্ব-জীবনের কথা তাঁহার বহু কবিতারই উপজীব্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি অনেক আবেদন নিবেদন জানাইয়াছেন। দেশে জিনিসপত্রের দর চড়িয়াছে, সংসার চালানো কঠিন—এই আকিঞ্চনও তিনি মহারাণীব উদ্দেশে যেমন প্রেরণ করিযাছেন—তেমনি নীলকরদের অত্যাচারের জন্য অভিযোগও জানাইয়াছেন। প্রজার পীড়ক নীলকররা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া প্রজার বিচার করিত। কবি তাই লিখিয়াছেন—

কুঠিয়াল বিচারকারী লাঠিয়াল সহকারী
বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা লোন্তা জলে চাষ।
হ'ল ডাইনের হাতে ছেলে সঁপা চিলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে শুনেনি কেউ শুনবে না।

'বড়দিন' কবিতায় সাহেবদের মত্তোৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন—সেই সঙ্গে সাহেবদের পদলেহীদের দিয়াছেন কশাঘাত।

সদাগরী আফিসের কর্ম্মীরা সঙ্গে ছুটি পাইত না—পূজার ছুটি মাত্র ৮ দিন। কবি তাহাদের দুঃখের কথা বলিয়াছেন—

বাটী আসা আশা মনে কতদিন আগে। পুরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে।
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব। আট দিন ছুটি শুনে কাঠ হ'ল সব।
কারো ভাগ্যে হবে শুধু মিছে ছুটোছুটি। যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটি।

গুপ্তকবি সেকালের সকল যুদ্ধ সম্বন্ধেই কবিতা লিখিয়াছিলেন। শিখযুদ্ধ, সিপাহিযুদ্ধ, কাবুলযুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ইত্যাদি সকল যুদ্ধেই ইংরাজের বিজয়—কবি ইংরাজের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই উল্লাস প্রকাশের বাচনভঙ্গী এমনি যে বুঝা যায় না, কবি সত্যই জয়ধ্বনি করিতেছেন না শ্লেষধ্বনি করিতেছেন।—যাহারা পরাজিত হইতেছে, যাহারা সবল না হইয়া সবলের সঙ্গে লড়িতে আসিয়াছে তাহাদের প্রতিও কবির কোন দরদ নাই।

কবি সেকালের মিশনারিদের বলিয়াছেন—

করিলে মানুষ পূজা উঠে মুক্তিধ্বজা। উদ্ধার না হয় কেন যত কর্ত্তা ভজা।
পরম পুরুষ যদি যিশুখৃষ্ট হায়। তবে কেন ম'রে গেল পেরেকের ঘায়?

সেকালের প্রথাপদ্ধতি আচার-অনাচার লইয়াও তিনি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেকালের মেকি পণ্ডিতদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কেবল মুখেই জাঁক ভিতরে সকলি ফাঁক মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে।
ফেঁদে টোল মারে ঢোল মিছামিছি করে গোল গোলমালে হরিবোল পাড়ে।

দেশের চারিদিকে অনাচার দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

কোথা পূর্ব্ব রীতি নীতি? অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত।
পূর্ব্বকার দেশাচার কিছুমাত্র নাহি আর অনাচারে অবিরত রত।

সেকালে দুর্গোৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খানা দেওয়া হইত। কবি সে প্রথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—

মন্দিরের মধ্য ভাগে কেন দাও খানা। পূজাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা।
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে। সাহেবে খাইলে মন মুক্তি পদ পাবে।
মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া। ফুলিশ ফুলিশ ড্যাম নিগার বলিয়া।

সেকালের কবি-যশঃপ্রার্থীদের লক্ষ্য করিয়া গুপ্তকবি বলিয়াছেন—

কোথা কবি কালিদাস বাল্মীকি ও বেদব্যাস কবিতার দশা দেখ আসি।
কুকুরেতে খায় হবি মূর্খ মুক হয় কবি সোনাকি কবিত্ব-অভিলাষী।

দেশে দেশীয় ভাষা ও বিদ্যার প্রতি অনাদর দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

তৃষায় হইয়া কৃশা যায় মাতৃভাষা। পুনর্ব্বার নাহি আর বাঁচিবার আশা।
বিদ্যা সব হয় লোপ চর্চ্চা নাই তার। মণিহারা ফণী প্রায় ধ্বনি মাত্র সার॥

কবি অনাচারী হিন্দুদের ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

হিন্দু নাম ইহাদের হয়েছে কেমন। নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন।
ইঁহারা করেন ঘৃণা খৃষ্টিয়ানগণে। কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে।

হিন্দুনারীদের ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

আগে—মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রতধর্ম্ম করত সবে।
একা—বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত—ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন—এ-বি লিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের আন্দোলন সুরু করিলে কবি লিখিলেন—

ঘোর—পাপে-ভরা হ'ল ধরা রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।

গুপ্তকবি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু—তাঁহার একদিকে ব্রাহ্মদল, আর একদিকে মিশনারীর দল। তৃতীয়দিকে হিন্দু কলেজের সমাজবিপ্লবীর দল—চতুর্থদিকে সাহেবরা—চারিদিক হইতেই তিনি পরিবেষ্টিত। সমাজ-সচেতন কবির কাব্য-রচনার বিষয়বস্তুর অভাব হয় নাই—কাজেই তাঁহার বিশ্রামও ছিল না। তাঁহার হিন্দু সংস্কৃতির এতগুলি শত্রু—অথচ তাঁহার কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নাই, তাহাদের লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ভার দিয়া গেলেন তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে।

কবির এ সকল রচনায় আসল কবিত্ব নাই। তাঁহার কবিত্ব খুঁজিতে হইবে তাঁহার ঋতুবর্ণনামূলক কবিতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে। তাঁহার কবিত্বের সন্ধান করিতে হইবে মানসমোহন পর্য্যায়ের কোন কোন কবিতায়, শকুন্তলায় ও সারদামঙ্গলে।

সারদামঙ্গল হইতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করি—

কন্যা ভাব পরিহরি মনে কর উমা স্মরি অবশেষে কেঁদে মরি ব্যাকুল হৃদয়।
করিতে করিতে ধ্যান সে ভাবে হারাই জ্ঞান উমা করে স্তনপান এই জ্ঞান হয়।
নিশিতে শয্যায় রই নিদ্রায় আকুল হই স্বপনেতে যদি কই তারা জয় জয়।
আঁচল ধ'রয়া তারা অভিমানে হয় সারা ফেলিয়া নয়নধারা কত কথা কয়।
বলে উমা একি ছি মা মাগো ওমা কর কি মা মা হয়ে এমন করা উচিত ত নয়।
উমা ডাকে মা মা ব'লে স্নেহরসে যাই গ'লে তখনি করিলে কোলে যাতনা না রয়।

মেনকা গিরিরাজের কথায় উমাকে ভগবতী জ্ঞানে ভাবিতে গিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এই দশা।

শকুন্তলার কয়েকটি চরণ—

ডালে বসি পিকবরে কুহু স্বরে গান ধরে গুণ গুণ গুঞ্জরিছে অলি।
মন্দ মন্দ গন্ধ বহে সুমধুর গন্ধবহে বিকসিত কুসুমের কলি।

শশীর শীতল কর অতিশয় সুখকর স্পর্শে করে হর্ষের বিধান।
সংযোগীর মহাসুখ হেরি প্রিয়জন মুখ বিয়োগীর বিয়োগে পরাণ।
নিশির কি কব শোভা ঋষির মানস লোভা শিশির অমিয় বরিষণ।
মেনকা এমনকালে বিথারিল মায়াজালে ধরিতে মুনির মৌন-মন।

ভাষার লালিত্য, পদবিন্যাসের চাতুর্য্য, রচনার পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য, ঘনঘন মিল, যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদি প্রয়োগে ঈশ্বর গুপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক সকল কবিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ Versifier ছিলেন। তবে তাঁহার রচনার শ্যাম সুচিক্কণপেলব পল্লবদলের অন্তরালে কবিত্বের সুরভি কুসুম খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশে একটি সনেট লিখিয়াছিলেন—তাহাতে বলিয়াছিলেন—

এই ভাবি মনে,
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে
তব চিতাভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে
স্নেহশিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে?

ঈশ্বর গুপ্তের কথা সকলে ভুলিয়া গেল বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—

আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি, নানা খেলা খেলিলে হরষে
যমুনা হয়েছ পার, তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা?

ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কে ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলাইয়া দিল? কবি নিজেই এজন্য দায়ী। মাইকেলের কবিতা পাইয়া দেশের লোক ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলিয়া গেল।

# বিদ্যাসাগর

## ( ১২২৭—১২৯৮ )

'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মাইকেল বঙ্কিমের মত সাহিত্যস্রষ্টা বলা চলে না—তিনি কাব্যকবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি কিছুই লেখেন নাই। তবু তিনি সাহিত্যিক, কারণ তিনি সৎসাহিত্য পরিবেষণের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার সীতার বনবাস ও শকুন্তলা ভাবানুবাদ হইলেও অভিনব সৃষ্টিরই মত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষতঃ বাঙ্গালা লেখকদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা-ত মাতৃভাষা, তাহার আবার শিক্ষা কি? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই—বাঙ্গালীরা যে ভাষায় কথা বলিত, সে ভাষায় কোন গদ্য গ্রন্থ রচনা চলিতে পারে তাহা সেকালের লোকের ধারণা ছিল না। সে ভাষায় শব্দসম্পদও খুব বেশী ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালীকে এমন ভাষা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন—যাহাতে অক্লেশে গদ্যগ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে। এক হিসাবে এই ভাষা কৃত্রিম ভাষা। বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি যেমন ব্রজগীতি রচনার জন্যই পরিকল্পিত, মাইকেলের ভাষা যেমন বীররৌদ্ররসাত্মক বৃহৎকাব্য রচনার জন্য পরিকল্পিত, বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষা তেমনি দেশে ও কালে দূরবর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা ও তাহার আবেষ্টনী বর্ণনার জন্যই পরিকল্পিত ভাষা।

বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী গদ্য ভাষার সহিত তুলনা করিলেই বিদ্যাসাগরের ভাষার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার উপর আর বলিবার কিছু নাই।

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য পুরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে সে কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু যেমন সমাজবন্ধন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে

কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব। কেবল মাত্র জনতার দ্বারা নহে, জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নবনব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যিনি এই সেনা-বাহিনীর রচনাকর্ত্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হইবে।

বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার শব্দগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।* গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।"

বিদ্যাসাগর সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে যে ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হইত অথবা কথকতা করা হইত তাহাতে শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটা ছিল প্রচুর, কিন্তু ভাবের প্রাধান্য ছিল না, রসের গন্ধও ছিল না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় হইল ভাবই প্রধান, ভাষা তাহার বাহনমাত্র। এই বাহন রাজার বাহন গজরাজের মত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দসমুচ্চয় বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এই শব্দ আহরণেও বৈশিষ্ট্য ছিল—একই ভাবের প্রকাশক বহু প্রতিশব্দের মধ্যে সুকুমার শ্রুতিমধুর শব্দগুলিই তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সমাস বিদ্যাসাগরের ভাষাতেও ছিল প্রচুর, কিন্তু

* বিদ্যাসাগরের ভাষার ছন্দস্রোতের ধ্বনিসামঞ্জস্য (Harmony) অপ্রবুদ্ধ উপভোগের মধ্য দিয়াও কিরূপ উচ্চ সাহিত্যের ধর্ম্ম পালন করে গদ্যকবি বিভূতিভূষণ 'তাহা পথের পাঁচালী'র শিশু অপুর কল্পনালীলার বর্ণনাপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন।

সমাসে সুললিত শব্দে শব্দে মিলনের ফলে সর্ব্বত্র বাক্যে একটা লাবণ্যের সঞ্চার হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের ভাষায় সন্ধিবদ্ধ সমাসের সংখ্যা অনেক কম। সন্ধি যেখানে শ্রুতিকটু, সেখানে তিনি সন্ধি বর্জ্জন করিয়াছেন অথবা এমন শব্দদ্বয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহাদের সহিত সন্ধি হয় না। ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হইলেও 'সতত সঞ্চরজ্জলধরপটল' না লিখিয়া তিনি 'সতত সঞ্চরমাণজলধরপটল' লিখিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের রচনায় বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয়াংশের মধ্যে চমৎকার ভারসামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ভাষার অন্তরস্থ সঙ্গীতকে তাঁহার কর্ণ সহজেই আবিষ্কার করিয়াছিল, সেজন্য তাঁহার ভাষায় একটা অপূর্ব্ব Rhythmএর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সামসময়িক লেখক অক্ষয়কুমারের গদ্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। অক্ষয়কুমারও সংস্কৃতানুগ ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতেন কিন্তু তাঁহার ভাষায় বিদ্যাসাগরী Rhythm নাই। বিদ্যাসাগরের এই ছন্দঃ-স্পন্দময়ী ভাষা বঙ্কিম প্রথম জীবনে অনুকরণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই ভাষার প্রভাব এড়াইতে চাহেন নাই।

বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক জগতের কোন ব্যাপারের বিবৃতির পক্ষে এভাষা উপযোগী নয়—দেশে ও কালে দূরবর্ত্তী বিষয়ের পক্ষেই ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। এই ভাষার দ্বারা প্রাচীনকাল ও দূরবর্ত্তী দেশের পরিবেষ্টনীরও সৃষ্টি করা যায়। বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ সংস্কৃত কথাসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্যের এবং ইংরাজি আখ্যায়িকা-সাহিত্যের অনুবাদে বা রূপান্তর-সাধনে এই ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে স্বতই এই ভাষা তাঁহার লেখনীতে আসিয়াছিল—সংস্কৃত সাহিত্যের সুললিত শব্দসমুচ্চয় স্বভাবতই বাঙ্গালা বাক্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। 'সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে' ইত্যাদি ভাষা আক্ষরিক অনুবাদেরই ভাষা। এই ভাষায় ভারতের প্রাচীন যুগের একটা আবেষ্টনীরও সৃষ্টি হইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষায় সমাসবন্ধন শিথিল করিয়া তিনি আখ্যায়িকা-বিবৃতির একটা নিদর্শনী রীতি দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক তিনি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের আখ্যানাংশের সহিত সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীকে সংস্কৃতসাহিত্য-পাঠে প্রণোদিত করা। সংস্কৃতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক দুইখানির চমৎকারিতার আস্বাদ দিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতিকে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস ও শকুন্তলা বিবৃতির গুণে অভিনব সৃষ্টিরই মর্য্যাদা

লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের কথা লিখিতে হইলে বাক্যে অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের বর্জ্জন যে কলাশ্রীসম্মত ও যুক্তিযুক্ত তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই যতদূর সম্ভব চলিত বাংলা শব্দ বা বিজাতীয় শব্দ ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি কতকগুলি ইংরাজি আখ্যায়িকার অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং ইউরোপের কতকগুলি মনীষীর জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের ভাষাও চলিত ভাষা নয়। চলিত ভাষা তখন পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য ছিল, তাহা গ্রন্থের ভাষা হইতে পারে না বলিয়াই লোকের বিশ্বাস ছিল। ভাষান্তরিত করিতে চলিত শব্দের প্রয়োজন যে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সংস্কৃত শব্দাবলীর সহিত চলিত শব্দের মিশ্রণ গুরুচণ্ডালিয়া দোষে দুষ্ট হইবে বলিয়া তিনি চলিত শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দ বর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলার চলতি গৎএর (বা ইডিয়মের) ভাবপ্রকাশদক্ষতা তিনি অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু বাক্যে চলতি গৎগুলিকে তিনি স্থলে স্থলে মার্জ্জিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' বলা বাহুল্য, ইহাতেও ভাবের প্রকাশ হইয়াছে—কিন্তু চলতি গৎএর নিজস্ব শক্তি পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যাসাগরের পরে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যরচনায় সংস্কৃত শব্দের পংক্তিতে চলতি শব্দ বসাইতে সুরু করিয়াছিলেন—এমন কি চলতি গৎগুলিকেও সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য বঙ্কিম ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের 'শবপোড়া-মড়াদাহের দল' বলিয়া উপহসিত হইতে হইয়াছিল।

লোকশিক্ষা ও সাহিত্যরস-পরিবেষণ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরকে বিচার-সভায় অবতরণ করিতে হইয়াছিল। বিচারসভার বাদানুবাদে ও সমাজসংস্কারের প্রসঙ্গে তাঁহাকে রচনায় যুক্তিমূলক ক্রমও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ এই অমূল্য গ্রন্থ দুই খানি বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ। এই বই দুইখানিতে বিদ্যাসাগর যে রচনাশৈলীর অনুসরণ করিয়াছেন—তাহা সীতার বনবাস বা শকুন্তলার রচনাশৈলী হইতে স্বতন্ত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শেক্সপীয়ারের Comedy of Errors নামক প্রহসন-খানির আখ্যানভাগকে বাঙ্গলায় উপকথার রূপ দান করিয়াছিলেন। ফলে ভ্রান্তিবিলাস অনুবাদমাত্র না হইয়া অভিনব রূপ ধরিয়াছিল। কিন্তু সীতার বনবাস বা শকুন্তলার মত ইহা আদৃত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ হাস্য-কৌতুক-রসসৃষ্টির ভাষা তিনি নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই। এই রস শূদ্ররস, বিপ্ররসের ভাষায় শূদ্র রসের প্রকাশ হয় না। সংস্কৃত নাটকেও এই রস প্রাকৃত ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যঙ্গার্থই যেখানে ব্যঙ্গকৌতুকের দ্যোতনা

করে, সেখানে ভাষার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অনুপযোগী নয়—সেজন্য Aesop's Fablesএর অনুবাদ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ভাষায় অসমীচীন বা অসঙ্গত হয় নাই।

বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহে অনুসৃত রচনাশৈলীই বাংলাদেশে প্রবন্ধরচনার আদর্শ শৈলীরূপে বিদ্বজ্জনের দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছিল। ইহাতে বিদ্যাসাগরের প্রাক্তনী রচনাশৈলীর অলঙ্করণ, অতিভাষণ, তারল্য, সৌকুমার্য্য ও হিল্লোলিত পদবিন্যাস বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রতিপাদনের দৃঢ়তা ও বাক্য-পরম্পরার সংযতশৃঙ্খলা এই ভাষাকে প্রবন্ধরচনার পক্ষে বিশেষতঃ তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাষা সরস না হইলেও রুক্ষ নয়, কারণ হৃদয়ের স্পর্শ যুক্তিপরম্পরার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। শাস্ত্রের বিচার করিতে করিতে যখন লেখক দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহার চারিপাশে চাহিয়াছেন—তখন তাঁহার ভাষা পণ্ডিতী আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়াছে।

বহুবিবাহ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই—

"কন্যার জননী অথবা বাটীর গৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়া পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন—অনেক দিন পরে কাল রাত্রে জামাই আসিয়াছিলেন, হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকালে কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই, অনেক বলিলাম এক বেলা থাকিয়া খাওয়াদাওয়া করিয়া যাও। তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না, সন্ধ্যার পরেই অমুক গাঁয়ের মজুমদারদের বাড়ীতে একটি বিবাহ করিতে হইবেক। পরে, অমুক দিন অমুক গ্রামে হালদারদের বাড়ীতেও বিবাহের কথা আছে। যদি সুবিধা হয় আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোরভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিলাম—ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামাইএর সঙ্গে খানিক আমোদ-আহ্লাদ করুক। একলা যাইতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ী কিছুতেই এল না। এই বলিয়া সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে মা তোরা যাস্ ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন।" অবাঞ্ছিত সংসর্গে কুলীন কন্যার গর্ভ-সঞ্চারের আবরণী হিসাবে দৃষ্টান্তটি উল্লিখিত হইয়াছে।

বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষাও বিদ্যাসাগরের,—এই ভাষাও বিদ্যাসাগরের। ইহাতে কি প্রমাণ হয়? যেমন বিষয়বস্তু ও তাহার আবেষ্টনী, ভাষা তদনুরূপ

হইবে বিদ্যাসাগর তাহা যে বুঝিতেন না তাহা নয়। তবে সাধারণতঃ তিনি অতীতকালের কথা লিখিতেন, বর্ত্তমান জগতের কথা বেশি লেখেন নাই, বলিয়া তাঁহার রচনাশৈলী চলতি ভাষার কাছাকাছি আসে নাই।

এই পুস্তক দুইখানিতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা অপেক্ষা চরিত্রই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের প্রেরণা পাইয়াছিলেন হৃদয় হইতে, মস্তিষ্ক হইতে নয়। বালবিধবার বেদনায় ও কুলীনকন্যাদের লাঞ্ছনায় তাঁহার বিরাট হৃদয় বিচলিত ও বিগলিত হইয়াছিল। যিনি আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদারক্ষার জন্য অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন—তিনিই আবার অসহায়া নারীর বেদনায় বালকের মত কাঁদিতেন। বিধবা-বিবাহপ্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাসাগর পরের দুঃখে ব্যথিত হইলে কেবল হাহুতাশ করিয়া অথবা সাহিত্যে তাহার বাণীরূপ দিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। তিনি কেবল সাহিত্যিক হইলে তাহাতেই পর্যবসান হইত—কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন প্রেমপ্রবণ, তেমনি কর্ম্মবীর। পরদুঃখ মোচনের জন্য তিনি সর্বস্বপণ করিতে রাজী হইতেন।

আজ বিধবা বিবাহ যে অসঙ্গত নহে,—তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রই জানেন এবং বহুবিবাহ ধীরে ধীরে যুগধর্মের তাড়নায় রহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর যখন আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন বিধবাবিবাহের কথা শুনিয়া সকলেই চমকাইয়া উঠিত এবং কুলীন কুপুরুষগণ তখন বহু বিবাহের সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বহু বিবাহকারী কুলীনপুরুষদের বিবাহের সংখ্যা তালিকাবদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তখনও এই কুপ্রথার প্রাধান্য কতটা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে কুলীন সন্তান হইয়া কুলীন সংসারের যাবতীয় কদাচার প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য দেশময় তাঁহার কত যে শত্রু হইয়াছিল—তাহায় ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সত্যসন্ধ বীরপুরুষ কিছুতেই বিচলিত হ'ন নাই।

তখনকার দিনে সমাজ এমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল যে, সমাজের লোকের বিবেক ও বিচারবুদ্ধির উদ্দেশে আবেদন করিয়া কোন ফল হইত না। সেজন্য বিদ্যাসাগরকে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য সত্যের সমর্থন করিতে হইয়াছে। দেশের অগ্রগণ্য পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় যুক্তিকে শাস্ত্রের শস্ত্রেই ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। ফলে, বিদ্যাসাগরকে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যুক্তি ও বিচারবিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের সঙ্গে যুঝিতে হইয়াছে। নারীর দুঃখ

মোচনের প্রেরণার জন্ম তাঁহার হৃদয়ে, কিন্তু যুঝিতে হইয়াছে তাঁহার মস্তিষ্ককে। তাঁহার মত হৃদয় এই হতভাগ্য সমাজের লোকদের থাকিলে এ সংগ্রাম করিতে হইত না।

আজ এই গ্রন্থ দুইখানির কোন ব্যাবহারিক মূল্য নাই। বিধবাবিবাহ ন্যায়োপেত ইহা প্রমাণ করার জন্য আজ শাস্ত্রের শ্লোক উৎকলনের প্রয়োজন নাই। তবু যে বিধবাবিবাহ চলে না—তাহার অন্য কারণ আছে। যে দেশে কুমারীর বিবাহই সমস্যা, সে দেশে বিধবার বিবাহ কি করিয়া চলে? বিধবার বিবাহ আরও ব্যয়সাপেক্ষ। পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে বিধবাকে নিজেই পাত্র নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিতে হয়। নগরের সমাজে এইরূপ ২।৪টির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে—কিন্তু পল্লীসমাজে আজিও বিধবার সে সাহস ও সুবিধা নাই। মৃতদার ব্যক্তিকে বিধবা বিবাহ করিতে হইবে, এই আইন না হইলে এ প্রথা চলা কঠিন। আর বহুবিবাহ শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয় মুসলমানদের মধ্যেও উঠিয়া গিয়াছে। এখন প্রয়োজন না থাকিলেও বিদ্যাসাগরের সময়ে এই আন্দোলনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে ফলও হইয়াছিল—,অন্ততঃ ইহা সেকালের শিক্ষিত লোকের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল।

ব্যাবহারিক মূল্য না থাকিলেও এই গ্রন্থদ্বয়ের অন্য মূল্য আছে; এই গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র, জীবনব্রত ও কর্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের সমাজের লোকের চরিত্র ও মনোবৃত্তিরও এই বই দুইখানি ইতিহাস। যদিও গ্রন্থ দুইখানি যুক্তিবিচারেরই পরম্পরা অবলম্বন করিয়াছে—তবু ইহাদের বক্তব্য হৃদয়াবেগ হইতেও বঞ্চিত নয়। বিদ্যাসাগরের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ যুক্তিগুলিকে বলীয়ানই করিয়াছে। হতভাগিনী বঙ্গনারীর জন্য বিদ্যাসাগরের অধীর উৎকণ্ঠা, আগ্রহ ও আকুলতা সমগ্র গ্রন্থ দুইখানির ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বিদ্যমান। ফলে, এই গ্রন্থ দুইখানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

যুক্তিমূলক নিবন্ধরচনার রীতির প্রবর্তক রামমোহন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও ভূদেব এই রীতিকে বহুদূর আগাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ দুইখানি বাংলার সংস্কৃতি-শকটের তুরঙ্গ-যুগলের মত অতি দ্রুতগামী বাহন। রামমোহন এদেশে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তক, বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ দুইখানির মধ্য দিয়া স্বাধীন চিন্তার ধারাকে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছেন।

### টেকচাঁদের

# আলালের ঘরের দুলাল

### ( প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮১৪-১৮৮৩ )

আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্রের ( টেকচাঁদ ঠাকুরের ) রচিত চিত্রোপন্যাস—বঙ্গসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। সংস্কৃত পণ্ডিতদের রচিত সন্ধি-সমাস-সমাকীর্ণ ভাষায় বিরক্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালী সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত। ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালায় প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতানুগ ভাষা বলিতে তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদির ভাষা বুঝিয়াছেন। এই ভাষাকে তিনি নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল বা নির্জীব ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভূদেব বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষা নিশ্চয়ই তাঁহার লক্ষ্য নয়। কিন্তু সে-ভাষাকেও তিনি স্বাভাবিক মনে করিয়া উল্লাস প্রকাশ করেন নাই। আলালী ভাষাকেই তিনি স্বাভাবিক ও জীবনী-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া এত উল্লসিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

এই আলালী ভাষা লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—এই ভাষার ক্রিয়াপদগুলি কিন্তু সবই সাধুভাষার! বঙ্কিমচন্দ্র ক্রিয়াপদের উপর জোর দেন নাই। বাক্যগুলিতে সংস্কৃত শব্দের বদলে চলতি শব্দের বহুল প্রয়োগের জন্যই এবং বাংলা চল্‌তি গতের ( Idiom ) বহুল সন্নিবেশের জন্যই তিনি ইহাকে প্রচলিত ভাষা বলিয়াছেন। "বাঞ্ছারাম বহুৎ ফন্দী, ফিকির, ফেরেক্কা করিয়া ফ্যাঁ ফ্যাঁ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" 'করিয়া' ও 'বেড়াইতে লাগিলেন' এই ক্রিয়া দুইটিকে উপেক্ষা করিলে এই ভাষাই ত আসল চলতি ভাষা। পণ্ডিতী ভাষার ক্রিয়াপদ আর আলালী ভাষার ক্রিয়াপদও ঠিক এক নয়। পণ্ডিতী ভাষার ক্রিয়াপদ 'কর্ণগোচর হইল', 'পরলোকগমন

করিলেন', 'অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইল'। আর আলালী ভাষার ক্রিয়া-পদ, 'শোনা গেল', 'মরিলেন', 'অস্ত গেল'। আলালী ভাষা চলতি ভাষা বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ শিক্ষিত লোকের মুখের কথা নয়। কলিকাতা অঞ্চলের বৈঠকী বা মজলিসী ভাষা। ইহাতে সংস্কৃত, ইংরাজি, ফারসী, গ্রাম্য সকল রকমের শব্দই আছে।

বর্তমান যুগের চলতি ভাষায় এই সবেরই মিশ্রণ আছে। আলালের ঘরের দুলালকে বর্তমান যুগের ভাষা তৈরির একটা বিরাট কারখানা বলা যাইতে পারে। এই ভাষা টেকচাঁদের পুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ অনুগামী। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "যতটুকু বলিবার আছে সবটুকুই বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজি, ফার্সী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" টেকচাঁদ ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। হুতোম অশ্লীলকেও ছাড়েন নাই, তাহা ছাড়া হুতোম রঙ্গরসিকতা করার জন্য কলিকাতার ইতর লোকের ভাষাই বেশি বেশি প্রয়োগ করিয়াছেন। বঙ্কিম হুতোমী ভাষাকে সমর্থন করেন নাই।

টেকচাঁদের ভাষায় এমন অনেক চলতি শব্দ ছিল, সেগুলি সাধারণ বাঙালীর অজ্ঞাত। সেগুলি এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। যেমন—"আমার দেখতা কত বেটা টেঁপাগোঁজা নড়েভোলা, টোয়ে বাঁধা, বালতিপোতা কারবারের হেপায় আগুন হইয়া গেল।"

এখনকার পাঠকগণ এ-ভাষা বুঝিবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষার যতই গুণগান করুন, তাঁহার পক্ষে এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা আভিজাত্যে বাধিয়াছে। তিনি আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া যখন আফিমখোর কমলাকান্ত সাজিয়াছেন—তখন তিনি বরং স্থলে স্থলে অনেকটা আলালী ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবেশী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বরং টেকচাঁদের ঘনিষ্ঠ অনুবর্তী। অবশ্য তিনিও ফারসী ও গ্রাম্য শব্দ যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়াছেন। বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতার বৈঠকী ভাষা অর্থাৎ আলালী ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ খাস কলিকাতার লোক হইলেও আলালী ভাষার অনুসরণ করিতে পারেন নাই—বঙ্কিমের মত তাঁহারও আভিজাত্যে বাধিয়াছে। আলালী ভাষা যে-সকল চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক সে-সকল চরিত্রসৃষ্টিও ইঁহাদের দুইজনের আভিজাত্যবোধের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার ক্রিয়া-পদগুলিই চলতি,—বাক্যে সংস্কৃত শব্দেরই বাহুল্য, আলালের ঠিক বিপরীত ধারা। চলতি শব্দের প্রাধান্য

রবীন্দ্রনাথের আলঙ্কারিকতা-সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। কলিকাতার জামাতা বীরবল বরং টেকচাঁদের অনেকটা অনুবর্তী। আলালী ভাষাকে তিনি যত দূর সম্ভব সুরুচিসম্মত করিয়া লইয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বীরবলের চেয়ে অনেক বেশী আগাইয়া গিয়াছেন টেকচাঁদের ভাষার দিকে। বীরবলের পর বাংলার চলতি ভাষা বিদেশী শব্দে ভরিয়া উঠিতেছে। সংস্কৃত শব্দ বর্জনের প্রয়াস একদিকে যেমন বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনি ইংরাজি শব্দের সংস্কৃত সমাসবদ্ধ প্রতিশব্দের সংখ্যা বাড়িতেছে।

মোটের উপর বর্তমান চলতি বাংলা ভাষা টেকচাঁদের কাছে যতটা ঋণী, ততটা অন্য কাহারও কাছে নয়। বঙ্কিমের উক্তি "শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল," একেবারেই অত্যুক্তি নয়।

টেকচাঁদ এই ভাষা চালাইবেন বলিয়া তদুপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করিয়াছিলেন, কিংবা বিষয়-বস্তুর জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে মনে হয়, বাহনের জন্য বাহ্য নয়, বাহ্যের জন্যই বাহন আসিয়াছে, যেমন,—যমের মহিষ, শিবের ষাঁড়। ষষ্ঠীর রাজহংস আর সরস্বতীর বিড়াল বাহন তো হইতে পারে না।

সেকালের বাবুরামদের দুলালগুলির জীবন-চরিত রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এমন চমৎকার বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করা চলে না। বাবুরামদের ঘরে ঘরে ছিল মোতিলাল। মোতিলালের অধঃপতনের ইতিহাস সংস্কৃতানুগ ভাষায় লেখা চলে না। শুধু মোতিলাল নয়, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ আছে, বিশেষ করিয়া ঠকচাচা আছে, বাঞ্ছারাম আছে, আশেপাশে আরও অনেকেই আছে, তাহাদের আচরণ ও ভাষণ-ভঙ্গী তাহাদের চারিপাশের ভাষাই সঙ্গে আনিয়াছে।

এ-ভাষায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। এ-ভাষাকে মাজিয়া-ঘষিয়া লওয়া হয় নাই। একেবারে যেন রেকর্ডে তোলা ভাষা। 'আলালের ঘরের দুলালে' সাহেব আছে, ফিরিঙ্গি আছে, মুসলমান মামলাবাজ আছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা আছেন, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আছে, চরিত্রহীন মুর্খ নিষ্কর্মা বিলাসী বাবুর মোসাহেবরা আছে, আবার সু-শিক্ষিত সাধু-লোকও দুই-তিন জন আছেন। সকলেই আপন আপন ভাষা লইয়া আসিয়াছে। ইহাদের সকলের ভাষা মিশিয়াই ত আসল বাংলা ভাষার সৃষ্টি। আলালী ভাষাই নানাজনের লেখার মধ্য দিয়া আজকালকার কথা-সাহিত্য' ও রম্যরচনার লেখকদের লেখনীতে আসিয়া পড়িতেছে।

এই তো গেল ভাষার উৎসের কথা। সাহিত্যিক উৎস সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বস্তুতান্ত্রিক কথাসাহিত্যের উৎসও আলাল।

দুর্গেশনন্দিনী বাংলা ভাষায় প্রথম রমন্যাস বা রোমান্স, আলালের ঘরের দুলালই প্রথম উপন্যাস। ইহাকে অনেকে সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলিয়া চিত্রোপন্যাস বলেন, কেহ কেহ নক্শা বলেন। ইহাকে সম্পূর্ণ উপন্যাস না বলিলে নূতন ধরণের কথা-সাহিত্য বলিতে হয়। ইহা হইতেই বাংলা ভাষার উপন্যাসের সূত্রপাতও বলিতে হয়। বর্তমান যুগের উপন্যাসের বহু অঙ্গের প্রাথমিক রূপ ইহাতে বর্তমান। ইহার চরিত্রসৃষ্টি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপন্যাসের উপযোগী। ঠকচাচার চরিত্রাঙ্কনে লেখক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি ও কলাচাতুর্য দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের পট-ভূমিকা ও পরিবেশও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের উপযোগী। সে-কালের কলিকাতা শহর ও তাহার উপকণ্ঠ, সাহেব কাজীর আদালত, নীলকরদের উপদ্রব, সে-কালের বিদ্যালয় ও শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা, যাতায়াতের মন্থর ব্যবস্থা, সদাগরী আফিস—সমস্ত মিলিয়া গ্রন্থে একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সে-কালের বিবাহ-সভা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিতর্কসভা, ধনীদের মজলিস, কৌলীন্যের উপদ্রব, জমিদারী সেরেস্তা—সমস্তের মিলনে একটি সামাজিক পরিবেষ রচিত হইয়াছে। সেকালের গতানুগতিক নৈতিক আদর্শ ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে রূপান্তরিত নৈতিক আদর্শের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ পুস্তকখানিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। দুর্নীতি-দূষিত পরিবেশের সহিত প্রধান চরিত্রগুলির বেশ সামঞ্জস্য আছে। এরূপ পরিবেষে যেরূপ চরিত্রের উদ্ভব ও সমাবেশ স্বাভাবিক—সেইরূপ চরিত্রই চিত্রিত করা হইয়াছে। ভাষা, পরিবেষ ও চরিত্রের এইরূপ শোভন সামঞ্জস্য ও সৌষম্য খুব সুলভ নহে। সে-কালের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র অংকনের জন্য বাবুরামকে প্রথমে ফৌজদারী আদালতের উৎকোচগ্রাহী শ্বেতাঙ্গপদলেহী 'কর্মচারী—পরে চাটুকারবেষ্টিত কুলীন ব্রাহ্মণ জমিদার ও নির্বোধ অন্ধ বাৎসল্য-স্নেহমুগ্ধ পিতার রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এইরূপ চরিত্রের অনিবার্য পরিণতি দেখানো হইয়াছে। বাবুরাম মুচিরাম গুড়েরই মাসতুতো ভাই, তবে মুচিরাম বাবুরামের চেয়ে ঢের বেশী চতুর। কাজেই পরিণতি একরূপ হয় নাই।

সে-কালের নারী-জাতির অসহায়তার চিত্র পাওয়া যায় বাবুরামের পত্নীদ্বয় ও তাহার অভাগিনী কন্যাদের জীবনে। বাবুরামের গৃহিণীর বৎসলতার প্রসঙ্গে কিছু মনস্তত্ত্বও আসিয়া পড়িয়াছ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক চরিত্র কিংবা অভিজাত চরিত্র লইয়াই রমন্যাস ও উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সামাজিক জীবনে শিক্ষায় ও নৈতিক বিচারে যাহাদের স্থান নিম্নে তাহাদের জীবন-কথা লইয়া টেকচাঁদই প্রথম কথা-সাহিত্য রচনা করেন। আজকালকার কথা-সাহিত্যে এ বিষয়ে টেকচাঁদের Realistic ধারাই ত চলিতেছে—বঙ্কিম-রমেশের তো কথাই নাই, রবীন্দ্রনাথের আভিজাতিক ধারাও তো আজ অনুসৃত হইতেছে না।

চরিত্রগুলিকে রক্তে মাংসে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য কেবল যে তাহাদের আচরণ ও মুখের ভাষণের উপরই নির্ভর করিলে চলে না, তাহাদের পরিবেষ ও আবেষ্টনকে যথাযথ রূপ দান করিতে হয়, তাহা লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। আদালতগৃহের বর্ণনা, শ্রাদ্ধ-সভার বর্ণনা, পাওনাদারদের দ্বারা আক্রান্ত ও মোসাহেবপরিবেষ্টিত জমিদারের বৈঠকখানার বর্ণনা, কাশীতীর্থের ঘাটবাটের বর্ণনা, জেলখানার বর্ণনা, পাঠশালার বর্ণনা ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইগুলি গল্পের অলস অলংকারমাত্র নয়।

সব চেয়ে বড় কথা, শ্লেষ-ব্যঙ্গ-রঙ্গরসে পরিষিক্ত লঘুতরল রচনাভঙ্গী টেকচাঁদের গ্রন্থকে অসামান্য সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। এমন চমৎকার সরস রচনাভঙ্গী অনেক বড় কথা-সাহিত্যিকেরও নাই।

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ উপন্যাস হিসাবে সার্থকতা লাভের বাধা—নৈতিক উদ্দেশ্যমূলক উপসংহৃতি—didactic conclusion, ইহা যেন আর্টের দিক হইতে anticlimax-এর সৃষ্টি করিয়াছে। তবে এ কথাও বলিতে হয়—এইরূপ একটা উদ্দেশ্যই আগাগোড়া প্রাধান্য লাভ করে নাই।

বরদাবাবু বা বেণীবাবুর চরিত্র আজকালকার বিচারে অস্বাভাবিক এবং জোর করিয়া অনুপ্রবিষ্ট মনে হইলেও সেকালের নবপ্রবুদ্ধ নৈতিক আদর্শের বিচারে অস্বাভাবিক মনে হয় না। এইরূপ চরিত্র দুর্নীতি-দূষিত পরিবেষের মধ্যে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করিবার জন্য একেবারে প্রয়োজন ছিল না, তাহাও বলা যায় না। এইরূপ চরিত্র নানাভাবে পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এইরূপ চরিত্রের অবতারণায় আর্ট ক্ষুণ্ণ হইলেও সুনীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্বে ভারসাম্য রক্ষার জন্য বোধ হয় লেখক ঐরূপ চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। সত্যই ত পৃথিবীটায় কেবল বাবুরাম, ঠকচাচা, মোতিলাল ও বাঞ্ছারামের রাজত্বই ত নয়,—২।৪ জন বেণীবাবু, বরদাপ্রসাদ, রামলালও ত আজও আছে।

আর্টের দিক হইতে আর একটা দোষ ধরা যাইতে পারে—অনেক স্থলে

অতিরিক্ত Emphasis দেওয়া হইয়াছে। ঠকচাচার ঠকামিতে বা বাঞ্ছারামের ফন্দী ফিকিরকে যদি অতিরিক্ত নাই ধরা হয়, মোতিলালের উপদ্রবে যে একটু বেশী রঙ চড়ানো হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নানাশ্রেণীর দুলালদের বেল্লিকপনা এক দুলালেই দেখানো হইয়াছে। লেখক এ-বিষয়ে অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠ হইলে বর্ণনা কদর্য হইয়া পড়িত। এবিষয়ে লেখক এ-যুগেব বহু লেখকের তুলনায় সংযমেরই পরিচয় দিয়াছেন।

সুশিক্ষা, সুনীতি, আত্মসংযম ইত্যাদি সম্বন্ধে স্থলে স্থলে উপদেশ ও বক্তৃতা আছে—সেগুলি যথাযোগ্য চরিত্রের মুখেই বসানো হইয়াছে—প্রসঙ্গক্রমে এইগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। এইগুলিকে অস্বাভাবিক মনে হয় না।

সামান্য সামান্য ত্রুটি থাকিলেও এই গ্রন্থখানি যে বঙ্গসাহিত্যেব অমূল্য সম্পদ—এই গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যে, ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে যুগান্তব আনয়ন করিয়াছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

# লোকশিক্ষক ভূদেব

( ১৮২৭-১৮৯৪ )

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়া দেশমান্য হইলেন—তাঁহারা ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণের তুলনায় সারস্বত ঋণটাকেই গুরুতর বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন,—লোকশিক্ষাপ্রচারের দ্বারাই এই ঋণের পরিশোধ করা যায়। যাত্রা, কীর্তন, কথকতা, পুরাণকাহিনী, পাঁচালী ইত্যাদির মধ্যস্থতায় দেশে যে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাঁহারা সে ব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থাই মনে করিলেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে তাঁহারা সকলেই Rationalist হইয়া উঠিয়াছিলেন। নির্বিচারে আর্ষবাক্য বা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসকেই তাহারা সুশিক্ষা মনে করিতেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, জনগণের সকল ধারণা যুক্তি-বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন—

১। জনসাধারণের মনে স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন করিতে এবং তাহাদিগকে কুসংস্কারমুক্ত করিতে।

২। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের জ্ঞান তাহাদের মধ্যে বিস্তার করিতে।

৩। আমাদের সংস্কৃতির প্রত্যেক অঙ্গটিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমাদের আগ্রহ প্রবুদ্ধ করিতে।

৪। আমাদের শাস্ত্রবিধির অভিনব যুক্তিমূলক ব্যাখ্যানের দ্বারা গতানুগতিক জড়তা দূর করিতে।

৫। সমগ্র বিশ্বের সহিত পরিচায়িত করিয়া জাতির কূপমণ্ডূকতা দূর করিতে।

এইজন্য তাঁহারা সর্বজনের অধি .্য হইবে বলিয়া বাংলা ভাষায় নিবন্ধাদি ও গ্রন্থ রচনার এবং সাময়িকপত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সাহিত্যসেবা ছিল গৌণ ব্রত,—লোকশিক্ষাদানই ছিল মুখ্য ব্রত।

এই লোকশিক্ষকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষিগণ।

ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিয়ো, রিচার্ডসনপ্রমুখ একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের ছাত্রগণের অনেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকেই চরম শিক্ষা বলিয়া মনে করিলেন।

তাঁহারা আমাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও গার্হস্থ্যজীবনযাত্রার সমস্ত অঙ্গকেই কুসংস্কারদূষিত জ্ঞানে বর্জনীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদেশের শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কোন সহানুভূতি ছিল না—কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের জন্য মাথা ঘামাইলেন না। তাঁহারা ছিলেন এদেশে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রচারক।

ভূদেববাবু তাঁহাদের সতীর্থ ছিলেন। তিনিও ছিলেন Rationalist, কিন্তু তিনি তাঁহার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দু কলেজের ছাত্র হইয়াও, সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দুর্দান্ত যুগধর্মের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও তিনি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যগৌরব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসভ্যতার যাহা কিছু শুভঙ্কর, সত্যাশ্রিত এবং আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরোধী সে সমস্তকেই তিনি "হংসৈঃ সাম্বু পয়ো যথা" গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এই যুগসন্ধিক্ষণে লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলের অপেক্ষা তিনিই বেশী করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্ত্য ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ও ইংরাজের Cultural Conquest হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠাই তাঁহার লোকশিক্ষা-ব্রত গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছিল।

১। বিশ্বের সকল সভ্যজাতির প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃতির সহিত পরিচয় সাধন ও ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক সমালোচনা,

২। আমাদের সংস্কৃতির ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের চিকিৎসা ও তাহার জীর্ণ ও বিক্ষত অংশের সংস্কার,

৩। আমাদের জাতির আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, সাংসারিক জীবনযাত্রা, সামাজিক ব্যবস্থা, পর্বপূজা ইত্যাদির ইষ্টানিষ্ট ও সদসৎ বিচার-বিশ্লেষণ এবং যতদূর সম্ভব যুক্তি দ্বারা সমর্থন,

৪। আদর্শ হিন্দু গার্হস্থ্য জীবন গঠন,

৫। প্রাচীন শাস্ত্র হইতে সত্যোদ্ধার এবং শাস্ত্রবিধির যুক্তিমূলক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যাদান—

এইগুলিই ছিল তাঁহার লোক-শিক্ষামূলক ব্রতের প্রধান অঙ্গ। সাধারণভাবে শিক্ষাবিভাগসম্মত শিক্ষা-প্রচারও তাঁহার ব্রতের একটি অঙ্গ ছিল!

ভূদেব ছিলেন শিক্ষাবিভাগেরই কর্মবীর। ইনি প্রথম জীবনে বালকদের শিক্ষাদান করিতেন শিক্ষকরূপে। তৎপরে যখন পরিদর্শকের কাজ করিতে

লাগিলেন, তখন আজন্মসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ভূদেব লোকশিক্ষার দিকেই পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। পরিদর্শক হিসাবে তিনি প্রধানতঃ শিক্ষকদের শিক্ষাদানই করিতেন। তিনি কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া বিদ্যালয়ের দোষত্রুটির সন্ধানের জন্যই মাথা ঘামাইতেন না, তিনি শিক্ষকদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিখাইতেন রাতিমত ছাত্রদেরই পাঠনার দ্বারা। তাহাতে পরোক্ষভাবে শিক্ষার উন্নতি হইত। কিন্তু তাহাতেও লোকশিক্ষার প্রচার হয় না দেখিয়া তিনি দুইভাবে লোকশিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইলেন।

১। সাময়িক পত্রের সাহায্যে ২। গ্রন্থরচনার সাহায্যে

প্রথমে ভূদেব নিজে 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদ-সার' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রের মধ্য দিয়া তিনি কেবল শিক্ষকদের নয়, পল্লীবাসীদেরও শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। ভূদেব তাই প্রস্তাবনায় লিখিয়াছিলেন—"পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলি ও নিমন্ত্রণের কথা হইয়া থাকে। অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষা-জনক কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাদৃশ লোকদের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। সংবাদগুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে।"

ভূদেব তাঁহার মাসিক পত্রের 'সংবাদসার' অংশের দ্বারা নানাবিধ চিত্তোৎকর্ষজনক সংবাদ পল্লীবাসীদের জন্য বিতরণ করিতেন। বলা বাহুল্য, এইগুলিতে চমকপ্রদ সংবাদ ছাপাইয়া আমোদ দেওয়া বা প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সৎ-শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ইহা ছাড়া, এই পত্রের মধ্য দিয়া ভূদেব পল্লীবাসীদের নূতন নূতন রাষ্ট্রিয় আইন সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিতেন। শিক্ষা-দর্পণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূদেব বলিয়াছিলেন—"শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লেখা যায় না এমন কথাই নাই। জর্মন দেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষাগ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য। মনুষ্যদেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই। চিরজীবনই মানুষকে শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে।"

ভূদেব বলিতেন,—"মানুষ যত কাল বাঁচিবে, তত কাল তাহাকে শিখিতে হইবে। ছাত্র-জীবন অল্পদিন স্থায়ী। গৃহস্থ-জীবন বহুবৎসরব্যাপী, সেজন্য লোক শিক্ষার প্রয়োজন ছাত্রশিক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় বরং বেশিই বলিতে হইবে।"

ভূদেবের দ্বিতীয় সাময়িক পত্র এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ। ভূদেব-বাবুর অনুরোধে সরকার এই পত্র প্রকাশ করেন। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, এই পত্রিকার মারফত সরকারী শাসননীতি দেশের লোকদের বুঝাইয়া দেওয়া। বারো বৎসর ইহা সরকারী পত্রই ছিল। তৎপরে ভূদেব ঐ পত্রিকার স্বত্ব সরকারের কাছ হইতে গ্রহণ করেন। তিনি সরকার হইতে মাসে মাসে এজন্য কিছু টাকা সাহায্য পাইতেন। তখন হইতে ইহা লোক-শিক্ষার পূরাপূর্‌রি বাহন হইয়া উঠিল। তখন ইহাতে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হইল। এডুকেশন গেজেট সত্য সত্যই এডুকেশনেরই পত্রিকা হইল। সেকালে ইহার মর্যাদা ছিল অনন্য-সাধারণ। ইহাতে দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি সাহিত্যরথীরাও নিযমিতভাবে লিখিতেস। এডুকেশন গেজেটেই ভূদেবের বিবিধ প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধেব নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যেকালে স্কুলকলেজের সংখ্যা ছিল খুবই কম, সেকালে এই এডুকেশন গেজেট দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের কাজ কবিয়াছিল। একালের তুলনায় সেকালে এইরূপ বাংলা ভাষার সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশী। যাহারা কেবল আর্ষবাক্য বা আপ্তবাক্যই শুনিয়া আসিয়াছে, তাহারা এই পত্রিকা পড়িয়া যুক্তিমূলক বিচারের মূল্যমর্যাদা উপলব্ধি করিতে শিখিল

ভূদেবের লোকশিক্ষাপ্রচারের দ্বিতীয় উপায় ছিল গ্রন্থরচনা। তিনি পনেরখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে ১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ২। পুবাবৃত্তসার, ৩। ইংলণ্ডের ইতিহাস, ৪। ক্ষেত্রতত্ত্ব, ৫। গ্রীস-বোমের ইতিহাস, ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস—এইগুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্য রচিত।

শিক্ষকদের কর্তব্য কি, কি কৌশলে শিক্ষা দিলে অনাবিষ্ট ছাত্রদে কাছে শিক্ষণীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক হয়, াক করিয়া শিক্ষার্থীব মনে আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপন করা হয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় লইয়াও তিনি এডুকেশন গেজেটে আলোচনা কবিয়াছেন।

তাঁহার রচিত "শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব",—শিক্ষা বিষয়ে একটি অমূল্য অবদান।

ঐতিহাসিক উপন্যাস, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুষ্পাঞ্জলি, বিবিধ প্রবন্ধ ( ৩ ভাগ ) প্রধানতঃ তাঁহার সাহিত্যসেবার নিদর্শন। এইগুলিতেও লোকশিক্ষার উপাদান যথেষ্টই আছে—তবে এইগুলিতে সাহিত্যসেবাই মুখ্য, লোকশিক্ষা গৌণ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'স্বপ্নলব্ধ ভারত' উপন্যাস না হইলেও ইহা বাংলা ভাষার কথা-সাহিত্যের অগ্রদূত। এই গ্রন্থখানি ইংরাজি Romance of History অবলম্বনে রচিত। ইহাতে একটি ছোট গল্প ও একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস আছে। ছোট গল্পটি গজনীর সুলতান আলপ্তগীনের জীবনী লইয়া রচিত আর উপন্যাসটি শিবাজীর সহিত শাহ্‌জাহানের কন্যা রোশিনারার কল্পিত প্রণয় অবলম্বনে রচিত। এই রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক, বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার দীক্ষা ইহা হইতেই সঞ্চারিত। ইহা যে লোকশিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা ভূদেববাবু ভূমিকাতেই বলিয়াছিলেন —"গল্পচ্ছলে যাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভূদেববাবু ভারতে বিদেশীয়গণের আগমন, শাসন ও সংস্কৃতি প্রচারের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সেইগুলি লইয়া সরস সাহিত্যের আকারে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে Utopian Ideas অনেক আছে। ভূদেব স্বধর্মনিষ্ঠ দেশভক্তির পরম গুরু। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন। এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের শেষ বাক্য—"আমার নাম আশা। উষা আমার ভগিনী, আমি উষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম।" ভূদেবের উষা ভারতের স্বাধীনতা নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়।

পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থের পরিচয়চ্ছলে লেখক বলিয়াছেন—'কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষে ব্যাস-মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন।' ইহার রচনাভঙ্গী সংস্কৃত পুরাণের অনুসৃতি। রূপকালঙ্কারের দ্বারা এই রচনাকে 'সাহিত্যের রূপ' দান করা হইয়াছে। ব্যাসদেব স্বজাতিবাৎসল্যের, মার্কণ্ডেয় অলৌকিক জ্ঞানের এবং গ্রন্থবর্ণিতা দেবী মাতৃভূমির প্রতীক। ইহা ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সরস বিবৃতি। ভূদেবের কথায় 'ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যা।' জনগণের কাছে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্যই ইহাকে সাহিত্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। লোকশিক্ষাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

তিন ভাগ বিবিধ প্রসঙ্গে দুই শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে। এক শ্রেণীর প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের সংস্কৃতিমূলক পরিচয়। এই শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত নাটক ও তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনাই বেশী। তাহা ছাড়া, বিদেশের শিল্প সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধমালা সম্পূর্ণ লোকশিক্ষা-মূলক। এইগুলি সামাজিক প্রবন্ধে স্থান পাইতে পারিত।

পুরাবৃত্তসারে ভূদেব মিশর, চীন, ফিনিসিয়া, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস, রোম ইত্যাদি দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিবার জন্য স্বজাতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা ও মহিমা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

প্রধানতঃ লোকশিক্ষার পক্ষ হইতে তাঁহার রচিত 'সামাজিক প্রবন্ধ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের বিজাতীয়ভাবাপন্ন সমাজে আবার জাতীয় ভাবের সঞ্চার কি উপায়ে, কি ভাবে হইতে পারে, সেই আলোচনাতেই এ গ্রন্থের সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইউরোপীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন—নানাকারণে বিদেশী সমাজ আমাদের অনুকরণীয় নয়। ভোগসর্বস্ব বিদেশী সমাজের দোষত্রুটি তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

এদেশে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংস্রবের সুফলগুলি দেখাইয়া তিনি কুফলগুলিও দেখাইয়াছেন। তিনি এই কুফল হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেশীয় সমাজকে সচেতন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনেও দেখাইয়াছিলেন—কেমন করিয়া কুফল বর্জন করিয়া সুফলভাগী হওয়া যায়।

তিনি নির্বিচারে ইংরেজের অনুকরণের পরিণাম কি তাহা বলিয়া আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয় ভাবের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। গ্রন্থের আভাষে তিনি বলিয়াছেন,—

"ইংরাজদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব শান্তি-সুখের অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজের কর্তব্য অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক।" তিনি বলিতে চান—এমন সুযোগ আমরা যেন হেলায় না হারাই।

ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' সাধারণ হিন্দু সংসারীদের, 'আচার প্রবন্ধ' হিন্দু-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হিন্দুদের এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' বিজাতীয়ভাবাপন্ন শিক্ষিত হিন্দুদের শিক্ষার জন্য রচিত। সামাজিক প্রবন্ধেই ভূদেব তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন। জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাজগঠনের প্রকৃতি ও আদর্শ বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ভারতীয় সমাজের গঠনে কোথায় সবলতা, কোথায়

দুর্বলতা। তিনি সমগ্র জগতের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন জগতের কোন জাতি বাধ্য না হইয়া নিজস্ব জাতীয় ভাবাদর্শ ত্যাগ করে নাই। সুখের বিষয়, ইংরাজ আমাদের সামাজিক-জীবনে সবল হস্তক্ষেপ করে না। আমরা যদি জাতীয় ভাবস্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিই, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় আত্মহত্যাই হইবে। রাষ্ট্রিয় পরাধীনতাকে ভূদেব আসল পরাধীনতা মনে করেন নাই—জাতীয় ভাবের বিসর্জনকেই তিনি প্রকৃত পরাধীনতা মনে করিতেন। আমরা ইংরাজ শাসন ও সভ্যতায় গা ঢালিয়া না দিয়া ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে আমাদের জাতীয় ভাবেরই উৎকর্ষ ও সংস্কারসাধন করিতে পারি। রাষ্ট্রিয় পরাধীনতারও তাহাতে শুভঙ্কর প্রয়োগ হইতে পারে। ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে এই শিক্ষাই দিয়াছেন—নিজের জীবনেও তিনি এই চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন—"ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি ও উদ্যমের মহামন্ত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল ভূদেবের প্রতিভায়। বর্তমান যুগের লোকগুরু হইবার অবিসংবাদিত অধিকার তাঁহারই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকগুরু রামগোপাল ঘোষও নহেন, রামগতি ন্যায়রত্নও নহেন।

আমাদের সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক আচারগুলিকে বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইতেছিল। ইহার একটা কারণ, ঐ আচারগুলি গতানুগতিকভাবে চলিয়া আসিতেছিল, যাহারা ঐ আচার অনুসরণ করিত, তাহাদের অগ্রগণ্য কৃতবিদ্য লোকেরাও বলিতে পারিত না কেন তাহারা ঐ সকল আচার নির্বিচারে অনুবর্তন করিয়া চলে। সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরা বলিত—এগুলি বর্বরোচিত কুসংস্কার। যাহারা অনুসরণ করিত তাহারা ইহাতে রাগ করিত, কিন্তু ঐগুলির সার্থকতা কি তাহা পণ্ডিতেরাও বুঝাইয়া দিতে পারিত না; কেবল বলিত "আর্য ঋষিদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে—তাই অন্ধভাবে অনুসরণ করি। ইহার আবার কৈফিয়ৎ কি?" ভূদেব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঐ সকল আচারের সার্থকতা কি, উহাদের মূলে কি গভীর সত্য নিহিত আছে, ঐগুলির সহিত আমাদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সংযোগ কতটা, তাহা যুক্তিগর্ভ বিচারের সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার প্রবন্ধ এই ব্যাখ্যারই পুস্তক।

আচার প্রবন্ধের প্রারম্ভে সদাচার সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

ধর্মোঽস্য মূলাস্বসবঃ প্রকাণ্ডো
বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ।
যশাংসি পুষ্পাণি ফলঞ্চ পুণ্যম্
অসৌ সদাচারতরুর্মহীয়ান্॥

ধর্মই সদাচার তরুর মূল, অসবঃ অর্থাৎ আয়ু ইহার কাণ্ড, বিত্ত ইহার শাখা, কাম্য-বস্তু ইহার পত্রাবলী এবং যশ ইহার পুষ্প।

ভূদেব সদাচারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া দেখাইয়াছেন—আয়ু, প্রাণশক্তি, ধর্মার্থকাম, যশ, পুণ্য—মানব-জীবনের যাহা কিছু কাম্য সমস্তই সদাচারের উপর নির্ভর করে। তাহার পর তিনি স্নান, আহার, নিদ্রা, বেশভূষা-ধারণ ইত্যাদি সমস্ত দিনের প্রত্যেক কৃত্যটি সদাচারের অনুবর্তী হইলে ধর্মার্থকামের কিরূপ অনুকূল হইতে পারে, তাহার বিচার করিয়াছেন।

পুংসবন হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হিন্দুর সংস্কারগুলি যে নিরর্থক নয়, তাহাই তিনি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন।

তাঁহার মূল বক্তব্য—প্রকৃত অর্থবোধ না করিলে শাস্ত্র অলস শাসনযন্ত্র, সার্থকতা না বুঝিলে হিন্দুর সকল সংস্কারই কুসংস্কার ও গূঢ় উদ্দেশ্যের সন্ধান না করিলে সদাচারও কদাচার বলিয়া মনে হইবে।

উদারবৃত্ত ভূদেব বলেন—যাহারা কদাচারী, গতানুগতিক বা সমাজদ্রোহী তাহারাই সম্পূর্ণ দোষী নয়। কারণ, তাহাদের শাস্ত্রাচারের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়াও দেওয়া হয় নাই,—তাহাদের জাতীয় ভাবের শিক্ষাও দেওয়া হয় নাই।

ভূদেব শাস্ত্রাচারের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া লোকশিক্ষা দিবার জন্যই আচারপ্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

ভূদেব তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইংরাজী শিক্ষিতদের চরিত্র ও আচরণের পরিবর্তন দেখিয়া গিয়াছিলেন। এই পরিবর্তনে ভূদেবের অবদান সামান্য নয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"পূর্বে ইংরাজি পড়িয়া দেশীয় যুবকেরা যেরূপ দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যের ন্যায় কথা কহিতেন এবং ব্যবহার করিতেন এখনকার ইংরেজি শিক্ষিতেরা প্রায় কেহই তেমন উন্মাদগ্রস্ত হয়েন না। * * * শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। লোকের মন যে ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের দিকেই আকৃষ্ট

হইতেছে এবং ইংরেজের অযথারূপ অনুকরণ যে এদেশের অনিষ্টকর এবং নীচপ্রকৃতিকতার লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।"

ভূদেব ছিলেন আদর্শ হিন্দু গৃহস্থ। গার্হস্থ্য জীবনেই তিনি তৃতীয় আশ্রমেরও শান্তি ও শুচিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও পারিপাট্যকে তিনি যোগের ন্যায় অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমাদের পারিবারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে অন্য জাতীয়দের তুলনায় কত বেশি উপভোগ্য, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যে শুচি-সুন্দর আদর্শ পারিবারিক জীবন গড়িয়াছিলেন তাহার ধারা বহুদিন পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। হিন্দু গৃহস্থদের পারিবারিক জীবনে শ্রীসৌষ্ঠব রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষাদানের অধিকার তাঁহারই ছিল।

পারিবারিক প্রবন্ধে তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি কি করিয়া সংসারে শান্তি, শুচিতা ও শ্রী-সৌষ্ঠব রক্ষা করিতে হইবে সে বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের হিন্দুসংসার বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রত্যেক সম্বন্ধটির সহিত সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই আদর্শ সাংসারিক জীবন। ভূদেব প্রত্যেক সম্বন্ধটির প্রকৃত স্বরূপ বিচার করিয়া সংসারের সহিত তাহার সামঞ্জস্যরক্ষার কথা আলোচনা করিয়াছেন। পুত্রকন্যা, মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী, ভৃত্য, অতিথি, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুকুটুম্ব ইত্যাদি যাহাদের লই..। আমাদের পারিবারিক জীবন, তাহাদের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করিলে গার্হস্থ্য জীবন শান্তিময় সুখময় হয়, সে সম্বন্ধে ভূদেবের মত কেহই চিন্তা করেন নাই। তাঁহার উপদেশগুলি, যতদিন হিন্দু-সমাজ থাকিবে, ততদিন শিরোধার্য হইয়া থাকিবে। সংসারের আয়ব্যয়-সঞ্চয়, রোগীর সেবা, পশুপালন, ভোজন, শয়ন, নিদ্রা ইত্যাদি কোনটিই আলোচনায় বাদ পড়ে নাই। অসংসারী লোকেরা মনে করিবে—এত সব তুচ্ছ কথা লইয়া অতবড় পণ্ডিত কেন মাথা ঘামাইয়াছেন? কিন্তু সংসারী লোকেরা বুঝিবে তাহাদের কাছে এগুলি আদৌ তুচ্ছ নয়। এইগুলির উপরই সংসারের সকল সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। এই গ্রন্থ গৃহস্থদের কাছে এই নব্যযুগের স্মৃতিশাস্ত্রের মত। যে গৃহস্থ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিছু শিক্ষালাভ না করিল, সে দুর্ভাগ্য। এত বড় লোকশিক্ষার বাহন বঙ্গভাষায় আর নাই।

ভূদেবের প্রগতিশীল বন্ধুরা বলিতেন—শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ হওয়া—জাতিধর্মনির্বিশেষে 'মনুষ্যসাধারণ' ধর্মের অনুশীলন, স্বজাতি পরজাতির মধ্যে

ভেদ বিমোচন। ভূদেব তাহা মনে করিতেন না। ভূদেব বলিতেন, বাঙালীর ছেলের শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ বাঙালী হওয়া, বাঙালী সমাজের কল্যাণসাধন ও জাতীয় গৌরববর্ধন। তিনি বলিয়াছেন, "তবে যে সাধারণ মনুষ্যধর্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে জাত্যনুযায়িনী শিক্ষাপ্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম সর্বজাতীয় মনুষ্য-শিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে।"

ভূদেবের মতে যত উচ্চশিক্ষাই অধিগত হউক, বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তি যে বাঙালী, তাহা তাহার ভুলিলে চলিবে না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার মতসাম্য আছে। যে শিক্ষায় জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ হয় না, ভূদেব তাহাকে শিক্ষাই মনে করিতেন না।

ভূদেবের রচনার ভাষা লোকশিক্ষারই উপযোগী ছিল। তাঁহার সামসময়িক বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজকৃষ্ণ ও সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়দের ভাষার তুলনায় তাঁহার ভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল। বর্তমান যুগের প্রাঞ্জল ভাষার সঙ্গে তাঁহার ভাষার খুব বেশি পার্থক্য নাই।

ভূদেব মনে করিতেন, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্রেরই মন দিয়া সংস্কৃত পড়া উচিত। তাহাতে আমাদের জাতি, দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। কূপমণ্ডূকতা ঘুচিয়া যাইবে। দেশী কূপও কূপ, বিলাতী কূপও কূপ। বিলাতী কূপে পড়িয়া যাহারা মণ্ডূকতা লাভ করিয়াছে তাহাদের কূপমণ্ডূকতা সংস্কৃত পড়িলেই দূর হইবে। অবশ্য দেশী কূপের মণ্ডূকদেরও বিলাতী বিদ্যার সন্ধান রাখা উচিত। নতুবা তাহাদেরও কূপমণ্ডূকতা ঘুচিবে না। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে তিনি বলিতেন—ইংরাজী সাহিত্য-দর্শনে কোন একটি ভাববস্তুকে মৌলিক বলিয়া মনে করিয়া আমরা প্রশংসায় গদ্‌গদ হই—সংস্কৃত শিখিলে আমরা দেখিব ঐ ভাববস্তুই কিংবা উহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাববস্তুই হয়ত বহুশতবর্ষ আগে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ গ্রন্থে উপনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের জাতীয় গৌরববোধ প্রবুদ্ধ হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি উপার্জিত অর্থ হইতে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দান করিয়া পিতার নামে বিশ্বনাথ-ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইতে বহু সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী নামে একটি আদর্শ চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সমস্ত জীবন তিনি মিতাচারী, সদাচারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়াই এই অর্থ তিনি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। এই অর্থ তিনি পুত্রপৌত্রদের

ভোগসুখে জীবনযাপনের জন্য অর্পণ না করিয়া সারস্বত ঋণ পরিশোধে বিনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচ্য সংস্কৃতির ভিত্তির উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় কিরূপে শিক্ষার চরম চরিতার্থতা লাভ সম্ভব তাহা বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের জীবনে আমরা দেখিয়াছি। দুইজনই আপন আপন অধীত বিদ্যাকে দেশময় বিকীর্ণ করিয়া সারস্বত ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। দুইজনেই মুখে যাহা বলিতেন, সকলকে যে উপদেশ দিতেন, নিজেদের জীবনেই তাঁহারা তাহার সার্থকতা দেখাইয়াছেন এবং দুই জনের ব্যক্তিগত জীবন হইতেও দেশের লোক বহু শিক্ষাই পাইয়াছে। দুইজনই এ দেশের আদর্শ শিক্ষাব্রতী ও লোকগুরু।

# মধুসূদন

মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদন কাব্য-সাহিত্যে অনেক কিছু প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অনেক কিছু দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য তাঁহার দেওয়া সব দান গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কি? প্রথমে ধরা যাক—অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মাইকেলের পর যাঁহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিলেন, তাঁহারা মাইকেলের ছন্দের আসল রূপটির অনুসরণ করিতে পারিলেন না। নাটকে ইহার রূপ আরো বিকৃত হইল। ইহা কৌতুকরসের বিষয়বস্তুর বাহন হইল। যাত্রাভিনয়ের নাটকের বীররসের বক্তৃতায় ব্যর্থ অনুকরণ চলিল। সৎ-সাহিত্য রচনায় অনুসৃত হইল না।

মাইকেল মহাকাব্য রচনা করিলেন। দুই তিনজন কবি তাঁহার অনুকরণ করিলেন—তার পর "কল্পনাটি গেল ফাটি' হাজার গীতে।"

মাইকেল পেট্রার্কার ধরণে সনেট রচনা করিলেন। কেহ কেহ এই রূপটি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে চলিল না, সনেট শেষ পর্যন্ত ১৪ চরণের পয়ারে পরিণত হইল। রবীন্দ্রনাথ সনেটের কঠিন বন্ধন পছন্দ করিতেন না।

মাইকেল পত্রকবিতা লিখিলেন বীরাঙ্গনা কাব্যে। আর কেহ ঐ শ্রেণীর কবিতা লিখিলেন না।

তাঁহার পদ্মাবতী নাটকের ঢঙে নাটক আর কেহ লিখিল না। তিনি বাংলা ছন্দে ছন্দঃস্পন্দসৃষ্টির জন্য অজস্র প্রচলিত অল্পচলিত সংস্কৃত শব্দের আমদানী করিলেন। পরে সে সকল শব্দ বাংলা কাব্যে চলিল না।

তিনি কবিতার চরণে যেরূপ ঘনঘন ছেদবিন্যাস করিয়াছেন, সে প্রথাও পরে চলিল না।

কবিতার চরণে ভিন্ন ভিন্ন পদের সংস্থান তিনি যেরূপ করিয়াছিলেন—পরবর্তী কবিরা তাহা করিলেন না।

মাইকেল যে কোন বিশেষ্যবিশেষণ-পদকে নাম-ধাতুতে ব্যবহার করিতেন, তাহা পরে ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মনে হয়, মাইকেল অনেক কিছু নূতন প্রবর্তন করিয়াছিলেন—কিন্তু বাংলা কাব্য-সাহিত্য সব গ্রহণ করে নাই বা করিতে পারে নাই। সে জন্য মাইকেলের রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াই রহিয়াছে।

মাইকেলের প্রত্যেক দানটি পরবর্তী সাহিত্যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার নিজস্ব রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বেশি দূর চলে নাই, কিন্তু ইহার অমিত্রাক্ষরতা—কবিরা গ্রহণ করিয়াছে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ রূপান্তরিত হইতে হইতে রবীন্দ্রনাথের অসমপর্ব্বীয় মুক্তক ছন্দে পরিণত হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মুক্তক ছন্দে পরিণতির ক্রমোন্মেষ-ধারা আমি 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' পরে সোদাহরণ বিবৃত করিব।

মহাকাব্য রচনার প্রথা সব দেশেই বিলোপ পাইয়াছে, ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে নাট্য-কাব্য। আমাদের দেশেও নাট্য-কাব্য অনেক রচিত হইয়াছে।

পেট্রার্কার সনেটরূপ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু চতুর্দশপদী গ্রহণ করিয়াছেন। গীতিকবিতার উচ্ছ্বাসকে সংযত কবিতার যে সীমাবন্ধন সনেটের আকারে মাইকেল দিয়াছেন—তাহার প্রয়োজনীয়তা সকল কবিই স্বীকার করিয়াছেন।

সনেটের ১৪ অক্ষরের চরণ ১৮ অক্ষরের চরণে পরিণত হইলেও এবং ১৪ লাইনের স্থলে ১৬ বা ১৮ লাইন হইলেও গীতিকবিতার মাইকেল-প্রবর্তিত সংহত আকৃতিরই রূপান্তর।

ওভিদের ধরণের পত্রকবিতা কেহ লিখে নাই বটে, কিন্তু পৌরাণিক বিষয়-বস্তুকে অভিনব ব্যাখ্যা দান করিয়া অভিনব ধরণের কবিতা রচনার ধারা বীরাঙ্গনা হইতে সূত্রপাত লাভ করিয়া আজিও চলিতেছে।

পদ্মাবতী নাটকের ভঙ্গী আর চলে নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণকুমারী ঐতিহাসিক নাটকের অগ্রদূত। মাইকেলের প্রহসনের ধারা আজিও চলিতেছে। অন্ত রচনায় যতই কৃত্রিমতা থাকুক, তাঁহার প্রহসনে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। প্রহসনে মাইকেল দীনবন্ধুর মতই পুরা বাঙ্গালী। প্রহসনের চরিত্রসৃষ্টিতে বাস্তবতার অভাব নাই—ভাষা সম্পূর্ণ চরিত্রগুলির মুখের উপযোগী! বাংলার প্রহসন-রচয়িতাদের গুরু মধুসূদন। মেঘনাদ বধের কবি যে দৃপ্ত আভিজাত্য হারাইয়া একেবারে সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে কতটা মিশিয়া যাইতে পারেন, তাহা প্রহসন দুইখানিতে দেখা যায়।

মাইকেলের ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দগুলি চলে নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা হইতে নব নব শব্দগ্রহণের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ তিনি দিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ লালিত্যবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত হইতে অনেক নূতন শব্দ আহরণ করিয়াছেন, মাইকেলের ব্যবহৃত পৌরুষব্যঞ্জক শব্দগুলি শ্রুতিকটু বোধ হওয়ায় তিনি বর্জন করিয়াছেন। সংস্কৃত হইতে নব নব শব্দ আহরণের প্রেরণা আমরা মাইকেল হইতেই পাইয়াছি।

মাইকেলের মত ঘনঘন ছেদ-বিন্যাস চলে নাই বটে, কিন্তু কবিতায় যথাযোগ্য ছেদবিন্যাস মাইকেলেরই প্রবর্ত্তন। তাহার আগে ত ছিল এক দাঁড়ি, আর দুই দাঁড়ি। অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পাঠে অনভ্যস্ত পাঠককে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘনঘন ছেদ বিন্যাস করিতে হইয়াছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যখন চলিল না—তখন ঐরূপ ঘনঘন ছেদবিন্যাসের কথাই উঠে না। তবু তাঁহার প্রবর্তিত ছেদবিন্যাস প্রয়োজনমত বাংলা কবিতায় চলিতেছে। তবে পাঠক এখন কোথায় কতটুকু থামিতে হয় শিখিয়া লইয়াছে, এখন আর ঘন ঘন ছেদবিন্যাস করিতে হয় না। মাইকেল তাঁহার রচনায় বহুস্থলে গর্ভবাক্য ( Parenthesis ) ব্যবহার করিতেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্যই ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ ছন্দ না লইলে গর্ভবাক্য প্রয়োগেরও প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলিতে ঐরূপ গর্ভবাক্যের সমাবেশ দেখা যায়।

বাক্যে পদের প্রচলিত ধরণের সংস্থান মাইকেলের পর আবার ফিরিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা মাইকেলের পদ্ধতির দ্বারা যথেষ্টরূপে প্রভাবিত হইয়াছে।

মাইকেল অজস্র নামধাতুর প্রযোগ করিয়া ভাষাকে বহুদুব আগাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে অতটা আগানো অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। মাইকেলের প্রবর্তিত সব নামধাতুর পদগুলি চলে নাই বটে, কিন্তু মাইকেলই নামধাতু রচনার পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছেন এবং এবিষযে সাহসেরও সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। কুসুমিযা, অঞ্জলিয়া, প্রভাতিল, মঞ্জরিল, মুকুলিয়া, আকুলিয়া, ব্যাকুলিছে, উচ্ছলিল, চঞ্চলিয়া, মন্দ্রিল ইত্যাদি নামধাতু রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করিয়াছেন। গদ্যেও ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বহু নামধাতুজাত বিশেষণ পদ চলিতেছে। যেমন—রূপায়িত, সীমায়িত, রসায়িত ইত্যাদি। শানচ্ প্রত্যয়ের নামধাতুর প্রয়োগও দিন দিন বাড়িতেছে—যেমন—শ্যামায়মান, ধূমায়মান, নব নবায়মান, বাষ্পায়মাণ ইত্যাদি।

কাব্য প্রাচীন হইলেই কেবল সুশিক্ষিত সাহিত্যব্রতীদেরই উপভোগ্য ও পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথেরও সেই দশা হইবে—তবে হয়ত একটু বিলম্ব হইবে। বিলম্বের কারণ, রবীন্দ্রনাথের পর বড় কবির আবির্ভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বহু বিচিত্র ধারায় বহমান। তাহা ছাড়া, তিনি লিরিক কবি, তাঁহার গানও আছে শত শত।

মাইকেলের প্রভাব বাংলার কাব্য-সাহিত্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। আমাদের দেশ অতিভাষণের দেশ,—সে জন্য কাব্যে উচ্ছ্বাসের মাত্রা ছিল

বেশী। মাইকেল কাব্যসাহিত্যে অসামান্য সংযমের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত সনেট সংযমের একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। পূর্ব নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে তিনি ভাবোচ্ছ্বাসকে সংহত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আজ সনেটের যে রূপই হউক—সংযমের ছকটা তিনিই দিয়া গিয়াছেন। সংযমের যে প্রয়োজনীয়তা আছে—তাহাও তাঁহারই শিক্ষা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সব চেয়ে বড় দান ইহার প্রবাহশীলতা ও বেগবত্তা ( Flow and dynamic force )। মিত্রাক্ষরী পয়ারে ও আয়ত পয়ারে ঐ দুটি ধর্ম সঞ্চারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর ছন্দ মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের কাছে ঋণী, ভারতচন্দ্রের কাছে নয়। মাইকেলের "রেখ মা দাসেরে মনে" ও "আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়"। এই দুইটি লিরিক হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের লিরিকের অগ্রদূত।

মাইকেল কাব্যে জাতীয়তাবোধেরও গুরু। এই জাতীয়তাবোধ রাক্ষসদের আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইলেও ইহার মূল্যের ও মর্যাদার তারতম্য হইতেছে না।

মাইকেলের মনুষ্যত্বের আদর্শ রাবণ ও মেঘনাদ হইলেও মনুষ্যত্বের মহিমা যে দেবত্বের চেয়ে ছোট নয় এবং নিয়তির সহিত সংগ্রামে পুরুষকারেই যে আসল মনুষ্যত্বের সার্থকতা, তাহা বঙ্গসাহিত্যে তিনি প্রথম দেখাইয়াছেন।

তামসিক বাঙ্গালীর সম্মুখে তিনি একটা রাজসিক আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জাতীয় জীবনে তেজস্বিতার সঞ্চার করিয়াছেন।

মানুষ যেমনই হউক, তাহার সুখদুঃখ আকাঙ্ক্ষার মূল্য অন্যত্র অস্বীকৃত হইলেও, কাব্যে তাহার মূল্য সমানই। এসত্য তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মাইকেল যে তাঁহার কাব্যে বীর ও রৌদ্ররসের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন—তাহার প্রভাব বাংলার বহু নাটকে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে তিনি একটা পৌরুষ সবলতা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনায় তামসিক ভাষা রাজসিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। জাতি যত তামসিকতার মোহ কাটাইয়া উঠিবে, ততই সে রাজসিকতার মর্যাদা উপলব্ধি করিবে এবং সাত্ত্বিকতার উচ্চগ্রামের নিকটবর্ত্তী হইবে।

# মধুসূদনের কাব্য-বিচার

মাইকেলের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ মাইকেলের বাল্য জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—কপোতাক্ষ তীরের পল্লী-প্রকৃতি তাঁহার অন্তরে কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ সাধন করিয়াছে। কপোতাক্ষতীরের প্রকৃতিকে তিনি বলিয়াছেন Meet nurse for a poetic child. একথা ঠিক নয়। মাইকেল সহজাত কবিশক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন—দেশবিদেশের রাশি রাশি সাহিত্য তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কবিশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এদেশে অবিরত সাহিত্য পাঠ করিয়া যদি কেহ বড় কবি হইয়া থাকেন, তবে তিনি মাইকেল। প্রকৃতির কাছে মাইকেল একটুকুও ঋণী নহেন। তাহা যদি হইত তাহা হইলে তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি সমাদরের আসন লাভ করিত। মাইকেলের কাব্যে ক্বচিৎ কখনো প্রকৃতিব সাক্ষাৎ মেলে; তাঁহাও নির্জীব পটভূমিকা রূপে—নয়ত মামুলী প্রথার অনুস্মৃতিরূপে। "তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠির স্পর্শ নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।" (রবীন্দ্রনাথ)। তাঁহার দৃষ্টি প্রকৃতির দিকে ছিল না—সাধারণ মানুষের দিকেও ছিল না—তাঁগার দৃষ্টি ছিল অসামান্য মানুষের দিকে। এ দৃষ্টিও চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টি নয়—স্বপ্নদৃষ্টি বা কল্পদৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে মানুষ ও মানুষের সৃষ্টির যাহা কিছু বৃহৎ তাহা বৃহত্তর, যাহা কিছু মহৎ তাহা মহত্তর, যাহা কিছু সবল তাহা সবলতর হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাঁগার কল্পসৃষ্টির বর্ণনা করিতে গিয়া যখন ভাষা খুঁজিয়া পান নাই—তখন অন্য কোন কবিকল্পিত (অনেকস্থলে পুরাণপ্রসিদ্ধ) ব্যক্তি বা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত আনুরূপ্য দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।*

এ বিষয়ে তিনি মিলটনের অনুগামী।

দৃষ্টি যাঁগার চারিপাশে, তিনিই প্রকৃতিকে দেখিতে পান—দৃষ্টি যাঁহার

* যেমন—

কনক আসনে বসি দশানন বলী
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ! শতশত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্ নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।

দেশেকালে দূরবর্ত্তী প্রদেশে বা কল্পলোকে তাঁহার দৃষ্টি ধাবিত হয় শূন্য পথে—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় না। প্রকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিতে হয়। প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই ব্যবধানই তাঁহার মনে প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

মাইকেল হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ, পারিবারিক-জীবন ত্যাগ করিয়া 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হইয়াছিলেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া নিঃসম্বল শেষ জীবনেও বাঙ্গালীর বেশভূষা আহারবিহার আচারবিচার গ্রহণ করেন নাই। খৃষ্টান থাকিয়াও তিনি খাঁটি বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার কাব্যে হিন্দুর পূজার্চ্চনা, আচারসংস্কার, শুচিতা, নিষ্ঠা, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের কথা আছে—কোথাও আলঙ্কারিক সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য—কোথাও হৃদয়াবেগের সুপ্রকাশের জন্য। ইহার জন্য অনেকে মনে করেন—মাইকেল খৃষ্টান হইলেও মনে মনে হিন্দু ছিলেন। ইহা প্রাকৃত জনের কথা। প্রকৃত পক্ষে তিনি সাহেবই বনিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি জানিতেন রসসৃষ্টি করিতে হইলে যে দেশের ভাষায় কাব্য রচনা করিতে হইবে, সেই দেশের ভাষায় ও সাহিত্যিক আবেষ্টনীতে যাহা কিছু শুচি সুন্দর, যাহা কিছু বিচিত্র ও অপূর্ব্ব, যাহা কিছু সম্পৎ সম্বল, তাহার সবই উপাদান ও উপকরণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে—নতুবা কাব্য হয় না। কোন ভাষায় রস-সৃষ্টি করিতে হইলে সে ভাষায়, যাহাদের ভাষা তাহাদের ঐতিহ্যে ও সংস্কারে, তাহাদের মনোভূমিতে রসের অনুকূল যাহা কিছু আছে—সমস্তেরই যথাযথ বিনিয়োগ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, তিনি কেবল গৌড়জনের জন্যই মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনের জন্য কাব্য রচনা করিয়াছেন—তিনি ব্রাহ্ম, হিন্দুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবু তিনিও এ সত্য ভুলেন নাই। এই সত্য অনেক মুসলমান কবি বুঝেন না বলিয়া তাঁহারা গৌড়জনের কবি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন বিজয়াদশমীর প্রতিমা বিসর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন—তখন ঔপম্যের জন্যই তাহার উল্লেখ

শ্বেতরক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরারে।

করিয়াছেন—প্রতিমাপূজার প্রতি সত্যই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তুলসীর তলে দেউটির কথাও উপমার খাতিরে।

তিনি যখন বলিয়াছেন—

গঙ্গাজলে পূর্ণ ঘট হায় ঠেলি ফেলি'
কেন অবগাহ দেব কর্ম্মনাশা জলে?
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি!

তখন গঙ্গা ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য বলেন নাই। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের জন্য ও হিন্দুসতী ভানুমতীর মুখের উপযোগী কথা বলিয়াই গঙ্গা ও ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। মাইকেলের বাগ্দেবী সর্ব্বদেশের কবিদের স্মরণীয়া ও বরণীয়া কাব্যলক্ষ্মী ছাড়া অন্য কেহ নহেন।

একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন—"এ দেশে ধর্ম্মবিষয় ছাড়া উৎকৃষ্ট কাব্য হয় না। মধুসূদন তাহা বিলম্বে অনুভব করিয়াছিলেন—তাই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করিয়াছিলেন।"

দুঃখের বিষয় সমালোচকের ধারণাই ভ্রান্ত। মেঘনাদবধই যে মাইকেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উৎকৃষ্ট কাব্য রচনায় ধর্ম্ম বাধাই জন্মায়, সহায় হয় না। আর ব্রজাঙ্গনাও ধর্ম্মমূলক কাব্যও নয়, উৎকৃষ্ট কাব্যও নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া রচিত হইলেও এই কাব্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা নাই। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ প্রেমিক, রাধা একজন প্রেমিকা মাত্র। কবিতাগুলি মিষ্টিক প্রকৃতির নয়, সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক প্রকৃতির। কবিতাগুলিতে প্রেমের গূঢ়তা বা গাঢ়তাও প্রকাশিত হয় নাই। এইগুলির দ্বারা মধুসূদন বাংলায় গীতি-কবিতার একটা অভিনব আকৃতি ও প্রকৃতিরই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পাঁচালী, কবির গান ও সখী-সংবাদ শ্রেণীর সঙ্গীতে গ্রাম্যতা লাভ করিয়াছিল—মধুসূদন ঐ লীলাকে আবার সাহিত্যের শিষ্ট গোষ্ঠীতে স্থান দিলেন। এই হিসাবে ব্রজাঙ্গনাকে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে যোগসূত্র বলা যাইতে পারে।

মাইকেলের রাবণ ধর্ম্মাধর্ম্মবোধহীন আদিম মানবজাতির অতিমানব। পাশবিক বলই আদিম মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল ও সম্পদ। এই পাশবিক বলের চূড়ান্ত নিদর্শনই রাবণ-চরিত্রে রূপ লাভ করিয়াছে। সে জানে পাশবিক বলের চূড়ান্ত প্রকাশই তাহার আত্মাভিব্যক্তি—তাহাই তাহার পৌরুষ। ইহাকেই সে মানবধর্ম্ম বলিয়া জানে। সভ্য মানবের সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধ তাহার

নাই। এই বোধ তাহার অনুগত রাক্ষসগণেরও নাই। বিভীষণের এই সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধ ছিল—তাহাকে সে পদাঘাতের যোগ্যই ভাবিয়াছিল। সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া সে যে কোন পাপ করিয়াছে তাহা সে মনে করিত না। সে জানিত, যে রক্ষা করিতে পারে না—তাহার সুন্দরী রমণীর অধিকারী হইবার অধিকার নাই, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা বোধও তাহার নাই, তাহার মতে ভিখারী রাঘবের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্তা নয় সীতা, তাহার যথাস্থান লঙ্কেশ্বরের সিংহাসনের বামার্দ্ধ-ভাগ। তাহার মতে সীতাকে সে-ই উদ্ধার করিয়াছে। সামান্য মানুষের এ কি কম স্পর্দ্ধা যে কতকগুলো বনের পশু সঙ্গে করিয়া সে আসে তাহার বনবাস-সঙ্গিনীকে সুরাসুরত্রাস বিশ্বজয়ী বীরের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লইতে! এই স্পর্দ্ধার জন্য রামই অপরাধী। সে বীরধর্ম্মই পালন করিয়াছে। তাহা ছাড়া, সূর্পণখার লাঞ্ছনার জন্য রাম লক্ষ্মণ দণ্ডনীয়, কেবল সীতা হরণ করায় তাহাদের গুরু পাপে লঘু দণ্ডই হইয়াছে। সূর্পণখা কোন অপরাধ করিয়াছে রাবণ তাহা মনেই করে না। কারণ, যে ধর্ম্মবোধ থাকিলে সূর্পণখাকে অপরাধিনী মনে করা যাইতে পারে সে ধর্ম্মবোধ তাহার স্বভাবতই ছিল না। এমন যে রাবণ, আর্য্যজাতির ধর্ম্মবোধ তাহার মধ্যে জন্মে নাই বটে, কিন্তু তাহারও স্নেহ ভালবাসা ছিল। তাহার অধিনায়কতা করিবার সকল গুণই ছিল। তাই রাক্ষসগণ ছিল তাহার বশীভূত, তাহার জন্য তাহারা দলে দলে প্রাণ দিয়াছিল,—তাহারাও ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করে নাই।

রাবণ দুইজন মানুষ ও তাহার বানরবাহিনীকে গ্রাহ্যই করে নাই। তাই সাগর বাঁধিয়া তাহারা লঙ্কায় উপস্থিত হইল। রাবণ ক্রমে বুঝিল নরবানর উপেক্ষণীয় নয়। তাহারা দেহে ও অস্ত্রে তাহার এবং তাহার পুত্রপৌত্র ও অনুচরগণের মত বলশালী নয় বটে, কিন্তু অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি তাহাদের অসাধ্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এই শক্তির কতকটা আধিদৈবিক কতকটা আধিভৌতিক। এই শক্তিই নিয়তি। রাবণ ধর্ম্ম মানে নাই, কিন্তু নিয়তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে। এই নিয়তির সহিতও রাবণ যুঝিতে চাহিয়াছে। কারণ, সে জানে পাশবিক বলের দ্বারা বিশ্বে সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করা চলে। কিন্তু যতই বড় বড় দুর্জয় বীরগণের পতন হইতে লাগিল—ততই তাঁহার কণ্ঠে আস্ফালনের তেজ কমিয়া আসিতে লাগিল—বীররস ক্রমে করুণরসে পরিণত হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত রাবণকে নিয়তির শক্তির অজেয়তা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু তবু সে স্বধর্ম্ম ত্যাগ

করিল না—কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'।

মেঘনাদ রাবণেরই আত্মজ, রাবণেরই অংশীভূত। অতএব মেঘনাদ সম্বন্ধে পৃথক করিয়া কিছুই বলিবার নাই। এই যে রাবণ আদিম মনুষ্য জাতির প্রতিনিধি, ইহার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য কবির সহানুভূতি কেন? মাইকেল রাবণকে সার্ব্বভৌম মানবতার প্রতীকস্বরূপ ধরিয়াছেন নিয়তির সহিত সংগ্রামে। আজিকার মানুষ কেবল পশুবলে বলীয়ান নয়, তাহার সম্বল এখন বহু প্রকারের বল। তবু নিয়তির বিরুদ্ধে তাহার সকল বলের পরিণতি রাবণ-মেঘনাদেরই মত। নিয়তির সহিত সংগ্রামে শতশত ঐরাবতের বলও নিষ্ফল, দুর্বল মানুষের ত কথাই নাই। মানুষের এই অসহায়তাই কবির চিত্তকেও কবির নিজের বারংবার পরাজিত পুরুষকারকে ব্যথিত করিয়াছে। এই ব্যথাই পুরুষকারের মূর্ত্তপ্রতীক রাবণ-মেঘনাদের প্রতি সমব্যথা বা সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সমবেদনাই কাব্যের পক্ষে ভূষণ হইয়াছে, দূষণ হইয়া উঠে নাই। কবি রাবণাশ্রিত পুরুষকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন—তাহাতে স্বভাবতই "নিজ বলে সতত দুর্ব্বল দেবের প্রসাদে সুফলভোগী দৈববলে বলী" রাম লক্ষ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে। বাল্মীকি বিভীষণকে পরম ধার্ম্মিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—তিনি ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের অনুরোধে রাবণকে ত্যাগ করিয়া রামপক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন—মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের দাসীপুত্র যুযুৎসুর মত। বাংলাদেশের লোকে এই বিভীষণের এই চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করে নাই। বাঙ্গালীরা বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক, স্বজনবিদ্বেষী, স্বার্থপর ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বলিয়া প্রবাদবচনের সৃষ্টি হইয়াছে—বিশ্বাসঘাতক ও বিভীষণ একার্থক হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে। রাবণকে মহাপাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে, কিন্তু 'রাঘবের পদাশ্রয়ী' বিভীষণকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে নাই—বিভীষণ সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার একেবারেই করে নাই।

মাইকেল তাঁহার কাব্যের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই বিভীষণকে ঘৃণিত চরিত্র বলিয়া পরিকল্পিত করিয়াছেন। মাইকেলের বিভীষণ স্বার্থপর, রাবণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সে লঙ্কার রাজা হইতে চায়। তাহা ছাড়া, লঙ্কা পাপভারে ডুবিবে, অতএব সে কেন অন্যের পাপে ডুবিতে চায়, আত্মরক্ষার জন্য সে রামের চরণে আশ্রয় লইয়াছে।

বিভীষণ আগে হইতেই বাঙ্গালীর মনে শ্রদ্ধার আসন পায় নাই। কাজেই বিভীষণ-চরিত্র অঙ্কনে মাইকেলের কোন সঙ্কোচ ছিল না—ইহার জন্য তাঁহাকে কোন জবাবদিহি দিতে হয় নাই।

মাইকেলের মতে রাক্ষসদের সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধ নাই—কিন্তু তাহাদেরও একটা সভ্যতা আছে। সেই সভ্যতার আদর্শে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বজাতিপ্রীতি সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। যাহারা ইহার চেয়েও বড় কোন আদর্শকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে—তাহারা অসভ্য বর্ব্বর। মেঘনাদ তাই বলিতেছে—বন্য বর্ব্বর রাম লক্ষ্মণের সহবাসে সুসভ্য রাক্ষস বিভীষণও বর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। আচারে আচরণে, আহারে বিহারে, সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে ইউরোপীয় হইলেও কবি যে বাঙ্গালী তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার চারিপাশের বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা অনেকরূপেই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই জাতির জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠাও ছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বাঙ্গালী ধর্ম্মভীরু, শান্তিপ্রিয়, হৃদয়বান্, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্ জাতি। এত গুণ থাকিতেও জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালী অনুপযুক্ত, তাহার সংকল্পে দৃঢ়তা নাই, শৌর্য্য নাই, সাহস নাই; তাহার চরিত্রে পৌরুষবলের অভাব, পদে পদে ধর্ম্মের বিধিনিষেধ মানিয়া চলে বলিয়া বাঙ্গালীরা আগাইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে কবির এই ধারণা হইতে কবির মনে মনুষ্যত্বের একটা অভিনব আদর্শ প্রবল হইয়া উঠে। ইহা মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শ নয়। বাঙ্গালী চরিত্রে যে যে বৃত্তির অভাব, সেই সেই বৃত্তির সমবায়ে এই আদর্শের সৃষ্টি। তাঁহার এই আদর্শে অতিরিক্ত Emphasis দেওয়ার ফলে রাবণ চরিত্রের রূপান্তর-সাধন। বাণিজ্যাবমুখ জাতিকে একদিন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা মাড়োয়ারী হও।" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই এই উক্তির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিয়াছিলেন। মাইকেল যদি বাঙ্গালী জাতিকে বলিতেন—"তোমরা রাবণ হও।" তাহা হইলে তাহার লক্ষ্যার্থ ঐ ভাবেই বুঝিতে হইত। রাবণের আদর্শেও একটা জাতীয় সত্য আছে,—কবি তাহাকে কাব্যকল্পনার অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন বলিয়া অনেকের চোখে বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বাঙ্গালী চরিত্রে যে যে বৃত্তি নাই—সেই সেই বৃত্তির সমবায়ে যে চরিত্রের সৃষ্টি, তাহাত বাঙ্গালীর পক্ষে অবাস্তব। এইরূপ চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে কাব্য রচিত—তাহা বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ কেমন করিয়া হইল? একটি কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। কবি রাবণ-চরিত্র গঠনে

বাঙ্গালীর হৃদয়বত্তা—তাহার পারিবারিক জীবনের সৌকুমার্য্য বর্জ্জন করেন নাই। বাঙ্গালীর সঙ্গে রাবণ-চরিত্রের ঐখানে সংযোগ। তাই রাবণ-চরিত্র বাঙ্গালীর কাছে অবাস্তব হইয়া উঠে নাই। এই জন্যই মেঘনাদ-বধ গ্রীক কাব্যের অনুগামী হইয়াও বাঙ্গালীর নিজস্ব কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালী হৃদয়ের কারুণ্য মেঘনাদ-বধকে গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালার অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। তবে এ কথাও ঠিক, মধুসূদন খৃষ্টান হইলেও আজিকার তথাকথিত সুসভ্য শিক্ষিত লোকেরা যতটা অবাঙ্গালী ও অহিন্দু হইয়াছেন—তিনি ততটা হইতে পারেন নাই। তাঁহার ম্লেচ্ছ জীবনের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন দ্বাদশ শিব মন্দিরের চূড়াগুলি দেখা যাইত। কাব্যের প্রয়োজনে তিনি হিন্দু সংস্কার ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন না-বলিয়া বরং বলা যায়, কাব্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি হিন্দু মনটিকে ও বাঙ্গালী স্বভাবটিকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন। "বহু বৎসরের বহু বিরুদ্ধ ভাব-চিন্তা নানা বিজাতীয় সংস্কারের উপরিসঞ্চিত স্তরভেদ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার জীবনের সেই নিম্নতলের ভাবস্তরে পৌছিতে হইয়াছিল।" ( মোহিতলাল )

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।' বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রকে জয়দেব ও মধুসূদনের সমশ্রেণীভুক্ত মনে করেন নাই। কবি বলিতে এখানে বঙ্কিম যুগপ্রবর্ত্তক কবিগুরু মনে করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস,—জয়দেবেরই অনুকারক। ভারতচন্দ্র তাঁহার মতে শব্দশিল্পী, মুকুন্দরাম সমাজচিত্রশিল্পী। মাইকেল নবযুগের প্রবর্ত্তক।

বঙ্গ-সাহিত্যে সনেট মাইকেলের একটি অপূর্ব দান। তিনি পেট্রার্কা প্রবর্ত্তিত সনেটের রূপই বাংলায় প্রবর্ত্তন করেন। সংহত পরিসরের মধ্যে একটি ভাবকে প্রকাশ করার পক্ষে ইহা সুন্দর ব্যবস্থা। গীতিকবিতার প্রেরণা দেয় মনের আবেগ, কিন্তু আবেগে সংযম না থাকিলে সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিকবিতা হয় না। সনেট বাধ্যতামূলক সংযমের বন্ধন। মাইকেলের ভাবোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক সংযম ছিল না, হয়ত তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াই এই সনেটের বন্ধন বরণ করিয়া লইয়াছেন। কয়েকটি সনেট বেশ রসঘন হইয়াছে।

মাইকেলের সর্বোৎকৃষ্ট গীতিকবিতাগুলি সনেটের আকারেই লিখিত। সনেটের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, প্রীতি, কারুণ্য, অনুতাপ ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কবি তাঁহার কবিজীবনের জন্য যে

স্বদেশীয় কবিগণের নিকট ঋণী—তাঁহাদের উদ্দেশে একটি করিয়া তিনি সনেট রচনা করিয়াছেন। কবি অবশ্য প্রথমেই পেট্রার্কার গুণগান করিয়াছেন—"বাগ্দেবীর বরে বড়ই যশস্বী সাধু" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে তাঁহার দান নিবেদন করিয়াছেন। বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, কাশীরাম, কৃত্তিবাস ইত্যাদি যে সকল কবির কাছে মাইকেল ঋণী, তাঁহাদের উদ্দেশে তিনি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। মুকুন্দরাম 'শ্রীমন্তের টোপর' ও 'কমলে কামিনীর' এবং ভারতচন্দ্র 'ঈশ্বর পাটনী' ও 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপির' মারফতে কবির কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশে সনেটে কবিকে কাব্য-ব্রজধামে রাখালরাজ বলিয়াছেন—দেশ ক্রমে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতেছে বলিয়া কবি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য মাইকেল নিজেই দায়ী, তিনিই দেশবাসীকে গুপ্ত কবির কথা ভুলাইয়া দিয়াছেন। এই সনেট লিখিয়া কবি যেন তাঁহার তথাকথিত অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে সনেট গভীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য খুব বড় একটা পরিসরের প্রয়োজন হয় না—সনেটের পরিসরই যথেষ্ট। কবি শ্রদ্ধানিবেদন ও প্রশস্তির একটি সুন্দর অঞ্জলিরূপ সনেটের ছলে আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন।

সনেটগুলি আরব্ধ হইয়াছে—'বঙ্গভাষা' দিয়া। অনুতাপের আন্তরিকতায় ইহা সাফল্যলাভ করিয়াছে। 'মিত্রাক্ষর' সনেটটিও বঙ্গভাষার উদ্দেশে। বঙ্গভাষাকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—যে তোমার চরণে মিত্রাক্ষর বেড়ী পরাইয়াছে সে বড়ই নিষ্ঠুর। কবি এই আক্ষেপটুকু অমিত্রাক্ষরে করিলেই ভালো করিতেন। যাহারা মিত্রাক্ষর বেড়ী পরাইয়াছে তাহারা ত নিষ্ঠুর। কবি সে হিসাবে ঘোরতর নিষ্ঠুর হইয়া পড়িলেন। সনেটের মিত্রাক্ষর যে বেড়ীর উপর বেড়ী—কঠোরতর বেড়ী। যাক—কবির শেষ সনেটটি কাব্যলক্ষ্মী বরদার উদ্দেশে। মাইকেলের গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে ইহা উৎকলন করি—

বিসর্জ্জিব আজি মাগো বিস্মৃতির জলে
( হৃদয়মণ্ডপ হায় অন্ধকার করি' )
ও প্রতিমা। নিবাইল দেখ হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি।
শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি

সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম। ডুবিল সে তরী
কাব্যনদে, খেলাইনু যারে পদবলে
অল্পদিন! নারিনু মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভোলে তারে?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দুর বনে।
এই বর হে বরদে, মাগি শেষবারে
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।

অনুতাপ দিয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর আরম্ভ অনুতাপেই শেষ।

এই সনেটটিতে কবির হৃদয়বেদনা আভাসিত হইয়াছে, পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভব নয়। কবি যেখানে হৃদয়বেদনার অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি দিতে চাহিয়াছেন সেখানে তিনি প্রচলিত ছন্দোরূপই গ্রহণ করিয়াছেন—যেমন—'রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে' অথবা 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' কোন ব্যথাঘন সনেট এই কবিতা দুইটির সমকক্ষ হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিক বলিয়াছেন—"চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অল্পকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে, যে তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।"

পদরচনার জন্য বিদ্যাপতি প্রচলিত মৈথিলী ভাষা ছাড়িয়া ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্ত্তন করেন। এই ভাষায় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিরা পদ রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মধুসূদন ও তাঁহার কাব্য রচনার জন্য প্রচলিত ভাষা ত্যাগ করিয়া নিজস্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ভাষার অনুকারকও কম হয় নাই, কিন্তু কেহই মাইকেলের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে কেহই জ্যা আরোপণ করিতে পারে নাই। এই ভাষায় কেহ কাব্য লিখিতে পারেন নাই বা এই ভাষা কাব্যে চলে নাই বলিয়া কেহ কেহ বলেন—উহা খাঁটি বাংলা ভাষাই নয়। বাংলা ভাষার মধ্যে কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের আবির্ভাবে বাংলাভাষা যদি তাহার জাতি হারায় তাহা হইলে অজস্র ফারসী আরবী শব্দের আবির্ভাবে বাংলা ভাষা কি তাহার রক্তবিশুদ্ধি রাখিতে পারিয়াছে? যদি উহা প্রচলিত ভাষা নাই-ই হয় উহা মহত্তর শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ভাষা। তাজমহলের উপাদান ও গঠনভঙ্গী সারা দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাই বলিয়া উহার উপাদান ও গঠন-ভঙ্গীর কে নিন্দা করিবে?

মাইকেল যে যুক্তাক্ষর-ঘন সংস্কৃত শব্দগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা নিরর্থক নয়। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য ঐরূপ শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বঙ্কিমও তাহা মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রয়োজন হইলে আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা এবং যুক্তাক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি ও তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।" যেখানে গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করিতে হইবে, পৌরুষ সবলতা প্রকাশ করিতে হইবে,—যেখানে রাজশ্রী-গরিমা প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে ভাবানুগত ধ্বনির সৃষ্টি করিতে হইবে, মাইকেল সাধারণতঃ সেখানেই ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। প্রচলিত সর্ব্বজনোচ্ছিষ্ট শব্দে সেখানে ভাব প্রকাশিত হইলেও, তাহার যথাযথ আবেষ্টনীর সৃষ্টি হয় না। তাহা ছাড়া, ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টির জন্যও এইরূপ শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন—

(১) যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

(২) কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।

(৩) রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি
কহিলা বীরেন্দ্র বলী।

(৪) গাণ্ডীব কোদণ্ডোপম ইরম্মদতেজঃ।
দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে।

(৫) প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুলি টঙ্কারে হুঙ্কারে
দহিলা খাণ্ডব রণে।

যাঁহারা মনে করেন কেবল ভাবপ্রকাশের জন্যই শব্দ, তাঁহারা একথা বুঝিবেন না। কাব্যে ধ্বনির জন্যও শব্দের প্রয়োজন। ভাবানুগ ধ্বনি যে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে কাব্যে সেই শব্দই চাই।* বঙ্গসাহিত্যে মেঘনাদবধের ভাব,

* সপ্তম সর্গ হইতে ভাবানুযায়ী ধ্বনি সৃষ্টির একটি উদাহরণ। রণযাত্রার বর্ণনা—

বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হ্রেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া

বাচন-ভঙ্গী, আদর্শ, ছন্দ সবই নূতন—কাজেই প্রচলিত ভাষাতে কুলায় নাই—নূতন নূতন শব্দকেও আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে।

মাইকেল নামধাতুর পদ অজস্র রচনা করিয়াছেন। চল্‌তি বাংলায় নামধাতুর বহু পদ প্রচলিত আছে—প্রাচীন বাংলাতেও ২।৫টির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নবরচিত বলিয়া অস্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু ইহাতে বাংলা ভাষার সম্পদ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতিভাবান সাহসী সাহিত্যিক ছাড়া অন্য কেহ নূতন কিছুর প্রবর্ত্তন করিতে পারে না। মাইকেলের প্রবর্ত্তিত সব নামধাতুর পদ চলে নাই বটে, কিন্তু নামধাতুর পদ গঠনের প্রথা কাব্য-সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে।

মাইকেলের ভাষা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মণিমুক্তায় ঝলমল করিতেছে। মাইকেলের অনুপ্রাস প্রচলিত ধরণের নয়—ইহাকে অনুস্যূত অনুপ্রাস বলা যাইতে পারে। একই বর্ণ চরণের প্রত্যেক শব্দের প্রথমে না বসিয়া শব্দের মাঝে মাঝে বসে। যেমন—'একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে।' তাঁহার অমিত্রাক্ষরে মিল ছিল না, কিন্তু যে দুইটি শব্দে মিল ঘটে, সেই শব্দ দুইটিকে চরণের মধ্যে বসাইয়া তিনি সমস্ত চরণকে হিল্লোলিত করিতেন—যেমন—দোষী আমি নাহ বৎস বৃথা ভর্ৎস মোরে। নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ঊষার চরণে। রোহিণীর স্বর্ণকান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি। অম্বুরাশিনাদসম কম্বুরাশি যবে।

যুক্তাক্ষরের অনুপ্রাস অনেক সময় নগর-সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গের মত বাজিতে বাজিতে চলে—

(১) উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জলকেলিকরে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে নিতম্বে মেখলা
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা রবাব মন্দিরা

---

চামর, অমরত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ
উদগ্র সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূত বৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী
অশ্বপতি, বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে।

আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে
সঙ্গীত তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
(২) গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে লঙ্কাপুরে শুনলো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী সম এবে
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা।

মাইকেল অর্দ্ধ যমকের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাকে ছেকানুপ্রাসও বলে। যমকে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্ত হয়—অর্থের বিশেষ পার্থক্য না ঘটাইয়া মাইকেল একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেন। যেমন—

(১) চলে দন্তী আস্ফালিয়া শুণ্ড দণ্ডধর যথা কালদণ্ড।
(২) দুর্দান্ত দানবে দলি নিস্তারিলা তুমি
দেবদলে নিস্তারিণি, নিস্তার' অধীনে
মাহিষমর্দ্দিনি মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে।

মাইকেলের কাব্যে দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনী ইত্যাদি উপমাত্মক অলঙ্কারের খুবই প্রাচুর্য। স্থলে স্থলে Homeric similieর ক্ষীণ অনুস্মৃতিও দেখা যায়। মাইকেল মহাভারতীয় ঘটনা ও ব্রজলীলা হইতে বহু স্থলে উৎপ্রেক্ষা ও উপমার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। জীবজন্তুর আচরণ হইতে উপমান-নির্বাচন গ্রীক সাহিত্যের অনুসরণ। কবি সিংহ, মৃগ, ব্যাঘ্র, রাজহংস, সর্প, শজারু, হস্তী ইত্যাদি জীবকে উপমান রূপে নির্বাচন করিয়াছেন। অনেক সময় কেবল ক্রিয়ার উপমা মাত্র। প্রত্যেক বক্তব্যকে উপমাত্মক চরণের দ্বারা সমাপ্ত করিবার একটা আগ্রহ সর্বদাই দেখা যায়—রূপবর্ণনাতে ত কথাই নাই। অনেক সময় তিনি সংস্কৃত কাব্যের উৎপ্রেক্ষা বা উপমা অক্ষুণ্ণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন—

(১) শিখিপুচ্ছচূড়া যেন মাধবের শিরে।
(২) এক প্রাণ দুই জন বাগর্থ যেমতি।
(৩) ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

তাঁহার নিজস্ব মৌলিক উৎপ্রেক্ষা অনেক সময় চমৎকার—

(১) ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে।

(২) সিন্দূর বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি ললাটে আহা তারারত্ন যথা।

(৩) এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি'
দশ দিশ।

কবি সাঙ্গরূপক অলঙ্কারেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন—

(১) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
রামাকুল। মুক্তকেশ মেঘমালা। ঘন
নিশ্বাস, প্রবলবায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

(২) জ্বলিছে অম্বর যথা বন-দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ শোভে তাহে গজবাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি'
নয়ন। চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবি পরিধি জিনি তেসোগুণে
ঝকঝকে চর্ম, বর্ম ঝলে ঝলঝলে।

# বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের কাব্যভাণ্ডারে মেঘনাদের পর বীরাঙ্গনার স্থান। বীরাঙ্গনা কাব্যে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দোরচনা সর্বাঙ্গসুন্দরতা লাভ করিয়াছে। রোমক কবি ওভিদের হেরোইদায় কাব্যের অনুসরণে ইহা রচিত। ওভিদ পত্রাকারে ( Epistles ) তাঁহার ঐ কাব্যের কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন। মাইকেল তদনুসরণে বাংলায় পত্রাকারে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। বীরাঙ্গনা নামটিও অভিদের হেরোইদায়েরই অনুবর্তন। ওভিদের কাব্যে ২১টি পত্র আছে—মাইকেল ১১টি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে মাইকেল বীরাঙ্গনা-চরিত্রের সন্ধান করিয়াছিলেন। সাধারণ বুদ্ধিতে একমাত্র জনাকেই বীরাঙ্গনা বলিয়া মনে হইবে। বীরাঙ্গনার অর্থ, মাইকেলের মতে,—যে নারী তাহার নারীত্বের স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহার পতিকে বা প্রণয়ীকে অকুণ্ঠ ভাবে মনের কথা জানাইয়াছেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলার পত্র কাতরোক্তিতে পূর্ণ—তাহা হইলেও এইরূপ পত্রদ্বারা রাজরজেশ্বরকে প্রেমাকুলতাজ্ঞাপনে বনবাসিনী ঋষিবালার অল্প সাহস প্রকাশ পায় নাই। সোমের প্রতি তারা একখানি চমৎকার পত্র-কবিতা। গুরুপত্নী তারা পতির শিষ্য সোমকে প্রেম নিবেদন করিতেছে—ইহা অত্যন্ত সাহসিকার কাজ। যাঁহারা সাহিত্যরসের রসিক নহেন, তাঁহারা বলিবেন—'যাহা শুনিলে কানে আঙ্ুল দিতে হয় তাহা লইয়া কবিতা খৃষ্টান মাইকেলই লিখিতে পারিয়াছেন।' কিন্তু এই কাহিনী যে ঋষিকবি রসালো করিয়া পুরাণেই রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবেন? সোম আদর্শ রূপবান্ সুন্দর যুবক, তারা সুন্দরী তরুণী, তারার স্বামী বৃহস্পতি পুরাণের 'চন্দ্রশেখর', তারা 'শৈবলিনী'। সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিলে দেখা যাইবে সোমের রূপে তারার বিমুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাব্যের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সামাজিক সংস্কারের বাহিরে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিশোধ প্রবেশ করিয়া এই কবিতা উপভোগ করিতে হইবে। এইরূপ সংঘটন বাঞ্ছনীয় নয় বটে, কিন্তু জগতে এইরূপ ঘটে। যদি ঘটে, তাহা হইলে কাব্যের বিষয়ীভূত না হইবে কেন? পঙ্ক ও মৃণালকে ভুলিয়া যেমন পদ্মের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি—এ কবিতা সেই ভাবেই উপভোগ করিতে হইবে। সমাজসংস্কার ও

পারিবারিক সংস্কার এমন কি দাম্পত্য সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী তারা একজন বীরাঙ্গনা।

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী কবিতায় রুক্মিণী বীরাঙ্গনা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুক্মী শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। রুক্মিণী অসহায়া কুমারী হইয়াও পারিবারিক বিধানের বিরুদ্ধে নিজের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পত্র প্রেরণ করিতেছেন,—রুক্মিণী তাই বীরাঙ্গনা।

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী একটি চমৎকার গীতি-কবিতা। কৈকেয়ী নিজ পুত্রের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। কৈকেয়ীকে বাল্মীকি দানবীরূপে চিত্রিতা করিয়াছেন। এই কৈকেয়ীকে বীরাঙ্গনা বলিলে আমরা আঘাত পাই। ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কৈকেয়ী অসামান্য পতিনিষ্ঠতা ও সেবা-পরায়ণতার দ্বারা দশরথকে বশীভূত করিয়া বরের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিল। সে সময় পাইয়া এই বর চাহিয়া লইতেছে। রামচন্দ্র তাহার স্নেহের পাত্র, কিন্তু ভরত তাহার গর্ভজাত সন্তান—এখানে মাতৃত্বই প্রবল হইয়া অন্য সমস্ত বিচার-বিবেচনাকে জয় করিয়া উঠিতেছে। রামচন্দ্র দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্বগুণান্বিত, রঘুকুলধুরন্ধর। প্রজাসাধারণ তাঁহাকেই চায়, দশরথের নয়নের মণি সে। এইরূপ ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের স্থলে ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনায় অত্যন্ত বেশী সাহসের প্রয়োজন হইয়াছে। এজন্য কৈকেয়ী বীরাঙ্গনা।

মাইকেলের এই কবিতা পড়িলে মনে হয়, দশরথ এক সময় কৈকেয়ীর রূপমোহে ও সেবাযত্নে মুগ্ধ হইয়াই ভরতকে রাজ্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে আছে—দশরথ বৃদ্ধ বয়সে যখন কৈকেয়ীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পিতা অশ্বপতির কাছে তাহার পাণিপ্রার্থনা করেন, তখনই অশ্বপতি দশরথকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন—কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যদান করিতে হইবে। মাইকেল সম্ভবতঃ এ সংবাদ জানিতেন না। তাহা জানিলে মাইকেলের কাব্যে কৈকেয়ীর অভিযোগ ও অভিমান আরো জোরালো হইত। দশরথই অপরাধী। এইজন্য দশরথ ধিক্কারের যোগ্য। কৈকেয়ী দশরথকে ক্ষমা করিয়া দেবী হইতে পারিত, আমাদের চোখে সে দানবী। মাইকেলের আদর্শে সে মানবী, তাহার সপত্নীবিদ্বেষ স্বাভাবিক, তাহার পক্ষে নিজ পুত্রের জন্য রাজ্যকামনা স্বাভাবিক এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য দশরথকে 'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি' বলিয়া ধিক্কার দেওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার অসামান্য সাহসের জন্য সে

বীরাঙ্গনা। কৈকেয়ীর এই পত্রোক্তি রামবনবাস নাটকের অন্তর্ভূত হইলে আমরা যেভাবে উপভোগ করিতাম, সেইভাবেই উপভোগ করিতে হইবে।

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা। মাইকেল রাবণকে একজন অতিমানব বীরাগ্রগণ্য রাজরাজেশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। সূর্পণখা তাঁহার কল্পনায় বীভৎসা রাক্ষসী নয়, রাজরাজেশ্বর রাবণের ভগিনী। অতএব সূর্পণখা বাল্মীকিবর্ণিত সূর্পণখা নয়, সে স্বৈরাচারিণী রূপবতী রাজভগিনী। সে লক্ষ্মণের শুধু রূপে নয়, গুণেও মুগ্ধ। সে লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করিতেছে। কবি লক্ষ্মণকে ছোট করেন নাই—বরং মেঘনাদবধের লক্ষ্মণেব চেয়ে এ লক্ষ্মণ মহীয়ান। তিনি সূর্পণখাকেই রূপান্তরিত করিয়াছেন। সূর্পণখা বিধবা, সে প্রেমের জন্য সামাজিক সংস্কার জয় করিতেছে। সে ধনুর্ধর লক্ষ্মণের মনের কথা না জানিয়াই তাহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে—সেজন্য তাহার সাহসের প্রয়োজন হইয়াছে। বিশেষতঃ সে বলিয়াছে—'প্রেমাধীনা নারীকুলে ডরে কি হে দিতে জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুলমানধনে প্রেমলাভলোভে কভু ?—' এজন্যই সে বীরাঙ্গনা।

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' কবিতায় দ্রৌপদী স্বর্গপ্রবাসী অর্জুনকে নিজের বিরহবেদনা জানাইতেছে। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী, একা অর্জুনের পত্নী নহেন। অর্জুনই বাহুবলে দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছিলেন—অর্জুনই পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যোগ্যতম বীরশ্রেষ্ঠ। অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব থাকা স্বাভাবিক। চারিজন স্বামীর নিকটে বাস করিয়াও দ্রৌপদী অর্জুনের বিরহে কাতরা হইয়া এবং ঋষিপুত্রের হাত দিয়া পত্র প্রেরণ করিতেছেন। অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকৃতির অনুমোদিত, কিন্তু পাণ্ডব-পরিবারের অনুমোদিত নয়—অর্জুনেরও অনুমোদিত নয়। সেজন্য দ্রৌপদীকে খুবই সাহসিকা হইতে হইয়াছে। তাই দ্রৌপদী বীরাঙ্গনা। যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মবলে কেহই বলী ছিলেন না—দৈহিক বলে ভীমসেন অপ্রতিরথ, বুদ্ধিবলে সহদেবের সমকক্ষ কেহ ছিল না, নকুল ছিলেন রূপে কন্দর্প। দ্রৌপদী ছিলেন তেজস্বিনী আদর্শ ক্ষত্রকন্যা, শৌর্যের ' জারিণী; অর্জুনই তাঁহার উপযুক্ত দয়িত। দ্রৌপদী মহাভারতেও আদর্শ বীরাঙ্গনা।

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী কবিতায় ভানুমতী বীরাঙ্গনা। অসহিষ্ণু মন্যুময় দুর্য্যোধনের উদ্দেশে ভানুমতী কতকগুলি কঠোর সত্যকথা বলিয়াছেন এই পত্রে। শকুনি যে 'কাল কলিরূপে' কুরুকুলে প্রবেশ করিয়া দুর্য্যোধনকে 'পাপ অক্ষবিদ্যা' শিখাইয়াছিল একথা দুর্য্যোধনের কাছে কর্ণকটু। সূতপুত্রের চেয়ে দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু কেহই ছিল না। ভানুমতী বলিলেন—'শৃগালে কি কভু

পারে বিমুখিতে কহ মৃগেন্দ্র সিংহেরে ? সূতপুত্র সখা তব কি লজ্জা নৃমণি !' যে পাণ্ডবগণের বিন্দুমাত্র প্রশংসা দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারে না—ভানুমতী অকুন্ঠিতভাবে তাহাদেরই প্রশংসা করিতেছেন। বিশেষতঃ পত্রে অর্জুনের অসামান্ত গুণিপনার কথা আর ফুরায় না—দুর্য্যোধনের বক্ষে ইহা শেলসম। সব চেয়ে কঠোর কথা ঘোষযাত্রায় চিত্রসেন গন্ধর্বের হাতে পুরনারীগণসহ দুর্য্যোধনের বন্ধনের কথা। ইহার চেয়ে অগৌরবের কথা আর দুর্য্যোধনের নাই। ভানুমতী সেই কথা স্মরণ করাইতেছেন—ইহা মন্যুময় কুরুরাজের মর্মে দারুণ আঘাত। তারপর শোচনীয় পরিণামের প্রসঙ্গ। কুরুসংসারে নারীর মর্য্যাদা যে কত, ভানুমতী তাহা ভাল করিয়াই জানেন। এই পত্রে ভানুমতী অসম সাহসিকতারই পরিচয় দিয়াছেন, ভানুমতী তাই বীরাঙ্গনা।

'জয়দ্রথের প্রতি' দুঃশলা কবিতায় দুঃশলা ভানুমতীর মতই জয়দ্রথকে অনেক সত্য কথা শুনাইয়াছেন। দুর্য্যোধনের সহোদরা হইয়া তিনি, দুর্য্যোধনই যে সকল অনর্থের মূল—নারীর অবমাননাকারী, একথা অকুন্ঠিতভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা নৈতিক সাহসের নিদর্শন। এজন্য অর্জুনের ভয়ে ভীতা হইয়াও দুঃশলা বীরাঙ্গনা।

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী কবিতায় জাহ্নবী শান্তনুকে প্রকৃতিস্থ হইতে বলিতেছেন। তিনি মানবী নহেন, তিনি দেবী। তিনি সবলে মায়াজাল ছেদন করিয়াছেন। তিনি অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করিতেছেন। ইনিও বীরাঙ্গনা।

উর্বশী মানবের প্রেমে স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথ্বীতলে যাইতেছেন, উর্বশী পুরূরবার শৌর্য্যে মুগ্ধ—বীরধর্ম্মের উপাসিকা উর্বশীও বীরাঙ্গনা।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা'—কবিতায় জনা যে বীরাঙ্গনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনা-প্রবীরের কাহিনী মাইকেল কাশীরামদাসের মহাভারতে পাইয়াছিলেন। অহিংসাব্রতী বৈষ্ণব নীলধ্বজ পুত্রহন্তা পার্থের সহিত সন্ধি করিলেন। জনার মাতৃহৃদয় ইহাতে সায় দিল না। নীলধ্বজের কাছে অর্জ্জুন নরনারায়ণ, জনার কাছে সে স্বৈরিণীসুত। পতি ও পত্নীর মতবাদে দারুণ দ্বন্দ্ব। জনা পতিব্রতা, কিন্তু সে তাহার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব স্বামীর চরণে জলাঞ্জলি দান করিতে পারে নাই। জনা পতিব্রতা, কিন্তু সে জননী। সে তাহার জননীত্ব বিস্মৃত হইতে পারে নাই। প্রবীরের শোকই তাহার একমাত্র বেদনা নয়, স্বামী পুত্রহন্তার সঙ্গে সন্ধি করিয়াছে—এই দারুণ অপমান তাহার অসহ্য। জনা বলিয়াছে—

ক্ষত্রকুলবালা আমি ক্ষত্রকুলবধূ .
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি ?

এই কবিতাটিতে মধুসূদন ক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয়ের যে অভিব্যক্তিকে রূপদান করিয়াছেন—তাহা বঙ্গসাহিত্যে অনন্যসাধারণ। এই কবিতা হইতেই গিরিশচন্দ্র জনা নাটকের প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদনের এই কাব্যের নায়িকাগুলি যে সকলেই বীরাঙ্গনা তাহা বুঝাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন কাব্যের হিরোইন শব্দেরই প্রতিশব্দ হিসাবে বীরাঙ্গনা কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজিতে নায়িকা-মাত্রেই হিরোইন। বীরের অনুরাগিণী বা বীরের জায়াও বীরাঙ্গনা, একথাও মনে রাখিতে হইবে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের উপাদান প্রধানতঃ মহাভারত হইতেই গৃহীত। মধুসূদন কাশীরামের মহাভারতকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এই কয়টি বীরাঙ্গনা পাইয়াছেন। তিনি যদি ব্যাসদেবের মূল মহাভারত খুঁজিতেন, আরও কয়েকটি বীরাঙ্গনা পাইতেন। মধুসূদন মগাভারত ও রামায়ণ হইতে নারীচরিত্রগুলি পাইয়াছেন—কিন্তু তিনি স্বকীয় আদর্শ অনুসারে তাহাদের পুনর্বিরচন করিয়া লইয়াছেন—এমন কি চরিত্রগুলিকে মাইকেলের সৃষ্টিও বলা যাইতে পারে।

বীরাঙ্গনা মাইকেলের শেষকাব্য। মাইকেলের রচনাভঙ্গী, ভাষাবিন্যাস ও ছন্দগঠন এই কাব্যেই চূড়ান্তসীমায় পৌঁছিয়াছে—এককথায় মাইকেল যে-ভাষাচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্য এত সংগ্রাম করিতেছিলেন, এই কাব্যেই তাহা সার্থক হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, মাইকেল তাঁহার সারস্বত তপস্যার ফল লাভ করার পর আর কোন শ্রেষ্ঠ অবদান গৌড়জনকে দিবার অবসর পান নাই। রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, অকাল জরায় জীর্ণ ও অভিভূত হইয়া তিনি বীরলোক লাভ করিলেন।

তিলোত্তমা-সম্ভবে মাইকেলের নূতন ছন্দ সুপরিণতি লাভ করে নাই; যতিপাত-দোষ ঘটিয়াছে স্থলে স্থলে। শব্দের চয়নে ও বয়নেও বহু ত্রুটি ছিল। তাহা ছাড়া, সাবলীল প্রবাহ সর্ব্বত্র নাই।

মেঘনাদবধে এ সকল দোষ অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু অনেকস্থলে অনাবশ্যক শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ আছে, নামধাতুর প্রয়োগও খুব বেশি, অলস বিশেষণের প্রাচুর্য্য আছে, অলস সম্বোধনপদের প্রয়োগে অনেক স্থলে ছন্দঃপ্রবাহ খণ্ডিত। নিস্তেজ, বৈচিত্র্যহীন দৃষ্টান্ত, উপমা, উৎপ্রেক্ষার সংখ্যাও অল্প নয়।

বীরাঙ্গনায় উপরিলিখিত দোষগুলি নাই, গূঢ় ও গাঢ় অনুভূতি রচনার ভাষাকে জোরালো করিয়াছে, অলস বাগ্‌বিলাস নাই বলিলেই হয়। মাইকেল